করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুশান্ত বসু
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩,

দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে বাঙলা কবিতার মহত্তম ব্যক্তিত্ব এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে তাঁকেও পেরোতে হয়েছে উপলবন্ধুর নানা পথ—তৈরি করতে হয়েছে বিহারীলালের গীতিকবিতার উৎস থেকে উজান-যাত্রার নিজস্ব কবি-ভাষা ও শৈলির নতুন-নতুন রূপ ও রীতি। ১৮৬১-তে তাঁর জন্মের পর থেকে পরবর্তী তিনটি দশকে তাঁর অনুযাত্র যে-সব কবিরা জন্মেছেন এবং বাঙলা কবিতার ভাণ্ডারটিকে আরও-একটু ভিন্নতর ব্যাপ্তি ও প্রসার দান করেছেন তাঁদের আমরা মোটা-দাগে চিহ্নিত করেছি, 'রবীন্দ্রানুসারী' কবি বলে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ষোলো বছর পরে জন্মেছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭-এ; তাঁর এক বছর পরে ১৮৭৮-এ যতীন্দ্রমোহন বাগচী; ১৮৮২-তে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক; ১৮৮৭-তে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং ১৮৮৯-তে কালিদাস রায়। এঁদের মধ্যে তিনজন হয়তো তাঁদের কবি-কারুকৃতি ও মনঃপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যে আলাদাভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন 'বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে' একটি নতুন তন্ত্র পরাবার কবিব্রত নিয়ে বাঙলা কবিতার জগতে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কি সেই নতুন তন্ত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পর্কিত শোক-কবিতায় নিজেই তা নির্দেশ করেছেন। এক 'অকুণ্ঠ পৌরুষ' নিয়ে কবিতার ভাস্কর্যধর্মী কায়াকান্তির মধ্যে দ্রোহদীপ্ত এক দেহজীবন-সত্যের স্বীকৃতি জানালেন মোহিতলাল। আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তির সমুজ্জ্বল দিনগুলির মাঝখানে আনলেন রোমান্টিকতা-বিরোধী তির্যক এক দুঃখবাদী অথচ জীবননিষ্ঠ নতুন স্বর।

এই তিনজনের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের বাইরে রয়েছেন যে চারজন কবি, সেই করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায় এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিক—এই 'কবি-চতুষ্টয়'-এর কথা একটু আলাদাভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে রবীন্দ্র-প্রয়াণ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের মতো সময়টাকে বলা হয়ে থাকে, 'রবীন্দ্র-যুগ'। এই সময়কালের মধ্যেই কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার পালাবদলের নতুন নতুন পর্ব এবং বাঁক। এই চারজন কবি তাঁদের পরিব্যাপ্ত কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে 'মানবজীবনের শুদ্ধশীল পুণ্য-গাথা, সহজ-সরল লোকায়ত জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ছবি—প্রকৃতির, বিশেষ করে চেনা বাংলাদেশের পল্লী-প্রকৃতি এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-শাক্ত এবং একটা বড় অংশ জুড়ে বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে লোকপ্রিয় এক মরমিয়া সারল্যের স্নিগ্ধ আন্তরিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।' বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের বিশাল বনস্পতি-তুল্য মহিমার কথা ভাবলে, এ কথা মানতেই হয় যে, এঁরা অপেক্ষাকৃত

'মাইনর পোয়েট'। এই 'মাইনর' পোয়েট কথাটা কিন্তু মোটেই তুচ্ছার্থবাচক নয়। 'রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে' রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বকে আরও বেশি করে প্রমাণ করবার এবং পরবর্তীদের সতর্ক করে দেবার জন্যেই কিন্তু এদের আবির্ভব হয়নি। মনে রাখা দরকার, একদিকে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তমান কাব্যসৃজন-প্রবাহ এবং বিশ-শতকের প্রতিবাদী স্পর্ধিত আধুনিকতার মাঝখানে বসে এইসব কবিরা বৃহত্তর বাঙালি পাঠক-সাধারণকে দিয়েছেন অন্য আর-এক ধরনের মানসভোজ্য। তা কি নেহাতই উপেক্ষণীয়? বাস্তবিকই এঁদের সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু উত্তরকালের জন্যও সঞ্চয়যোগ্য উপাদানের অভাব নেই। রূপরীতি ও ভাবনার দিক দিয়ে এঁরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের অধমর্ণ অবশ্যই, কিন্তু অকৃতার্থ নন। কবি-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন এঁদের কবি-চারিত্র্যকে :

> 'এঁরা দীর্ঘকাল বাঙালি পাঠককে কাব্যরসের মোটা ভাতকাপড় জুগিয়ে এসেছেন—একসময় এই কাজ করেছেন মঙ্গলকাব্যের প্রণেতাগণ ও কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস। তাছাড়া এঁদের কাব্য প্রাচীন বাঙলা কাব্যের সঙ্গে নব্য বাঙলা কাব্যের যোগ রক্ষা করে এসেছে। এঁরা না থাকলে দুই কালের যোগ আরও অনেক দুস্তর হয়ে উঠতে পারত।'

তিনি আরও মন্তব্য করেছেন,

> 'উচ্চাঙ্গ কাব্যরস-বোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্য-পর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইঁহাদের মত কবিদের উপরে, এদেশে বিদেশে , সর্বদেশে ও সর্বকালে।'

একদিন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে এই-সব কবিদের অজস্র স্মৃতিধার্য পংক্তি গেঁথে থাকতো সব-ধরনের পাঠকদের ভালোলাগা-মনের গভীরে। কিন্তু উত্তরকালের ঐতিহাসিক দায়হীনতা ক্রমশই এঁদের ঠেলে দিচ্ছে এক শ্রদ্ধাহীন, ঐতিহ্য-অচেতন বিস্মৃতির অন্ধকারে।

২

উক্ত কবি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রবীনতম করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছ-সাত বছরের বালক করুণানিধান গিয়েছিলেন ধানবাদের নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে তাঁর বাবা নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি ছিলেন সেখানকার স্কুলের মাস্টারমশাই। চারপাশে পাহাড় আর বাঁধে-ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ি নদী 'ক্ষুদিয়া'র প্রান্তবর্তী মনোরম নিসর্গ কল্পনাপ্রবণ শিশুর মনে গভীর আনন্দ-বিস্ময় জাগিয়ে তোলে; তেমনি তাঁর বাবার সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং সাময়িক-পত্রিকাগুলি তাঁকে উন্মুখ করে তোলে কবিতার প্রতি। পরে বাবা গেলেন মানভূমে কাশীপুরের রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে। সেখানে দারুকেশ্বর নদের তীরে, দশ-এগারো বছর বয়সে তাঁর কবিতা লেখা শুরু। মণিহারা পাহাড়ের ফাঁকে সূর্য উঠে সোনার তাজ পরিয়ে দিত পঞ্চকোট

পাহাড়ের মাথায়—ভেসে আসত শালফুলের গন্ধ আর পাখপাখালির কলতান। পদ্য লিখে বালক শোনাতেন তাঁর সঙ্গীদের। আমৃত্যু সেই কবিতাই ছিল তাঁর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য আশ্রয়। জীবনের হাজারো ঝড়-ঝাপটা আর দুঃখ-দৈন্যের মাঝখানেও স্বপ্নমুগ্ধ এই কবির বুকে অনির্বাণ জ্বলেছে সেই অম্লান শিখাটি। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে শান্তিপুরে ফিরেও তিনি নিমগ্ন থেকেছেন কবিতার সাধনায়। এই কবিতার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠাভূমিতে তেমন দাগ রাখতে পারেননি—জীবন ও জীবিকার নানা-ক্ষেত্রে তাড়িত অনিশ্চিত কাজের ফাঁকে চিরদিন অতন্দ্র-সাধনায় কবিতা লিখে গিয়েছেন।

জীবনের একেবারে শুরুতে তিনজন কবির উত্তরাধিকার বর্তেছে কবির মনে। এঁরা হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং রবীন্দ্রনাথ। গোবিন্দপুরের সেই কৈশোরক রবীন্দ্র-দীক্ষা যে তাঁর হাতে ভাষা ও ছন্দের কতখানি স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিল তার পরিচয় মিলবে তাঁর ছাত্রবয়সে 'প্রকৃতি'-নামক হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা-ধৃত 'আবাহন' কবিতাটির মধ্যে। কবি লেখেন : 'কনকাঞ্চলে অমৃত-উর্মি আন্দোলি/কিরীট-কিরণে গগন-গঙ্গা উজ্জ্বলি/এস গো মোহিনী নামিয়া।/কবে কোন দিন মধু-পূর্ণিমা নিশীথে/হবে দু-জনায় নব-জ্যোৎস্নায় মিশিতে।/গর্জন গুরু বুক দুরু-দুরু/ সহসা যাইবে থামিয়া।/আজি এস গো শোভনে নামিয়া।' শব্দধ্বনির কারুচিত্রশিল্পী করুণানিধানের কাব্যবাণী-সিদ্ধির প্রাথমিক নিদর্শন এই কবিতাংশটি।

প্রথম জীবনে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা ও উত্তেজনায় যে 'বঙ্গমঙ্গল' রচনা করেছিলেন কবি, সেখানে দীর্ঘ-বিতানিত পয়ারে অধঃপতিত বাঙালির মর্মবেদনাপীড়িত কবি-চারণের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আত্মবিলাপ হয়তো কবিতা-হিসেবে খুব উঁচুমানের দাবি করতে পারে না। তবু তারই মাঝখানে ছ-মাত্রার কলাবৃত্ত-ছন্দবৈচিত্র্যে লেখা তাঁর এই মাতৃবন্দনা আমাদের আকৃষ্ট করে : 'কিরণে-শিশিরে-কুসুমে-ধান্যে তরুণী/অয়ি মা ভরণি, অমৃতস্তনী ধরণী,/ত্রিভুবন মনোহারিণী,/অয়ি সুরধুনী-ধারিনী,/শোভন-শান্ত উজ্জ্বল-শ্যাম-ভূষণা,/গগনপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীল-বসনা—/নমো-নমো মম জননী।' বাস্তবের রূঢ়-রুক্ষ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে, বিশ শতকের সেই সূচনামুহূর্তে, চব্বিশ বছরের যুবক করুণানিধান আত্মঘাতী বাঙালীর অধঃপতিত অস্তিত্বের যে ছবি এঁকেছেন সরল কলাবৃত্ত-ছন্দের এক ভিন্ন চালে, তা হয়তো তেমন উঁচু-মাপের শিল্পকর্ম নয়, তবুও এক স্তম্ভিত আসন্ন-প্রলয় দুঃসময়ের বৈতালিকের এই মাতৃমন্ত্রের আন্তরিকতা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

১৯০৪-এ প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রসাদী'-তে নিসর্গের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি আধুনিক বাঙলা লিরিকের আদিগুরু বিহারীলালের অণুযাত্র এক কবি হিসেবে তাঁর নতুন অভীপ্সা শুনিয়েছেন। 'প্রাণের উতল উচ্ছ্বাসে', 'কিছু নূতন গন্ধ', 'নূতন মন্ত্র', 'নবীন স্পন্দ' এবং 'নূতন সুরের সরণি' বেয়ে তাঁর নতুন পথে চলার আকাঙ্ক্ষা। 'আমারে অর্পিনু আমি মানবের তরে/মানবের শুভব্রতে'— এই

'ধ্রুব-ব্রত'। সংকল্প করেছেন, 'সবারে বাসিয়া ভাল হে নিখিল স্বামী মরিবার অধিকার পাই যেন আমি।/এই মোর ধ্রুব-ব্রত। এই মোর সব।/পূজা-অর্চনায় তব এই মোর স্তব।' এই নিখিলস্বামীর প্রতি তাঁর অনন্য-শরণ আত্মনিবেদনের আর্তি যেমন তাঁর শেষ-জীবনের গীতানুবাদ এবং গীতানুবর্তনের পর্ব পর্যন্ত অবিরল ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি তাঁর প্রেম, প্রীতি এবং বাৎসল্যের এক সর্বব্যাপিনী রসধারায় অভিস্নাত তাঁর কবিচেতনা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে বহুমাত্রিক জীবনের বিচিত্র রসরূপমূর্তি রচনা করেছে । আর ঋতুচক্রের আবর্তনে নিত্যজায়মান অবিনাশী কাব্য প্রকৃতিকে ঘিরে রূপ ও অরূপের অনিঃশেষ আরতি-মন্ত্র রচনা করেছে। করুণানিধানের কবিতার সেই বিশিষ্ট ধ্রুবপদের সার্থক পরিচয়ের সূচনাও এই 'প্রসাদী' কাব্যে। তার কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের যে উত্তরাধিকারের কথা আমরা বলেছি, তারও নানা অনুচিত্র-প্রতিমার শুরু এখানে, এবং তা তাঁর 'ধানদূর্বা' পর্যন্ত প্রসারিত।

'প্রসাদী'-র পরে ১৯১১-তে প্রকাশিত 'ঝরাফুল'-এ করুণানিধানের এই বিশিষ্ট প্রবণতারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

> 'তিনি প্রকৃতির দুলাল। প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্য দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের ন্যায় সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে-করিতে গীতে-ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ... এই অনুকরণের দিনেও যে কবি আপনার বিশেষত্ব যথাসাধ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কবি যে ভাবের কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, যেভাবে চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। সামান্য উপকরণে ঘরোয়া কথার উপমা সজ্জিত করিয়া এরূপ সৌন্দর্যসৃষ্টি আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে অতি বিরল।'

'সাধনা'-র সম্পাদক এবং বিগত দিনের বিশিষ্ট কবি ও কথাসাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঝরাফুল'-এর ভূমিকায় এই যে-কথাগুলি লিখেছিলেন, এর মধ্য থেকেই চিনে নেওয়া যায় করুণানিধানের স্বতন্ত্র কবিস্বভাবটিকে। যদিও তাঁর কাব্য-সাধনার প্রথম প্রহরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন সৌন্দর্যের মন্ত্রদীক্ষা, তাঁর 'রবীন্দ্র-আরতি'-তে সে-কথা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন কবি। তবুও তিনি যে নিছক রবীন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্রানুকারী কবিমাত্র নন, স্বভাব-স্বতন্ত্র আর-এক ভিন্ন-পথযাত্রী কবি, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মন্তব্যটি তা স্পষ্টভাবে চিনিয়ে দেয়। তিনি তাঁর ভূমিকায় যে দেশীভাবের মিঠে গন্ধের কথা বলেছেন—বলেছেন 'ছবির পর ছবি' গাঁথা তাঁর কবিতা-জগতের কথা, সে 'ছবিগুলি সবই যেন একটির পর একটি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া যায়, ছায়ালোকমন্ডিত মায়াপুরী সৃজন করে'। বাস্তবিকই বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির জোড়ে গাঁথা তারই সৌন্দর্যস্বরূপের ঐশ্বর্য ধরা পড়েছে তাঁর 'ঝরাফুল-এ কবিতাগুলির মধ্যে।

১৯১৩-তে প্রকাশিত 'শান্তিজল' কাব্যেও তাঁর এই একই ভাবের নানামুখী সম্প্রসারণ লক্ষ্য করি। ইতিমধ্যে ভারতের পথে-প্রান্তরে পরিব্রাজক এই সৌন্দর্য-

সন্ধানী কবি-তীর্থঙ্কর তাঁর পুরাচেতন স্বপ্নদর্শী কবিদৃষ্টিতে লোকায়ত এবং লোকোত্তরকে কখনও কান্তকোমল ললিত শব্দের নম্র রমণীয়তায় আবার কখনও-বা মন্দ্র-গম্ভীর শব্দের ধ্রুপদী ঐশ্বর্যে কী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার বহুকৌণিক ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য রূপের পরিচয় পাওয়া যায় এই কাব্যে। ১৯২১-এ প্রকাশিত 'ধানদূর্বা' কাব্যেও তাঁর কবিধর্মের পূর্বোক্ত প্রবণতাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাহিনী-কবিতার অন্য-একটি আদর্শদীপিত ধাবা। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়-প্রমুখ তাঁর সমকালীন সহযাত্রী কবিরাও দেশি-বিদেশী ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং অন্যান্য ভাবতীয় উত্তরাধিকাবকে যেমন তাঁদের নিজস্ব জীবন-ভাবনা ও কাব্যাদর্শের দিক থেকে নিজেব মতো করে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের বিভিন্ন কাহিনী কবিতায়, তেমনি করুণানিধানও এই-ধরনের কিছু কবিতা লিখেছেন তাঁর ভাবনার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে মণীষী বন্দনামূলক আরও কিছু অন্য-ধরনেব কবিতা।

'ধানদূর্বা'ব পব ১৯৩০-এ প্রথম প্রকাশিত হয় করুণানিধানের কাব্য-চয়নিকা 'শতনরী'। আব ১৯৪৮-এ তারই আর-একটি সংযোজিত সংস্করণ। এরই মাঝখানে ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'রবীন্দ্র-আরতি'। শতনরীর দুটি সংস্করণে তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত কবিতাগুলির সঙ্গে অগ্রন্থিত যে কবিতাগুলি সংযোজিত হয়েছে, সেখানে জীবনের সায়াহ্ন-সরণিতে দাঁড়ানো ভক্তিপ্রণত কবিকণ্ঠে শরণাগতির সুরটি যেমন বেজেছে, তেমনি স্মৃতিকে নতুন আকার দেবার এক ভিন্ন-প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-বন্দনার পাশাপাশি বন্দনা করেছেন তাঁর আরাধ্য ঈশ্বরের—আর পুনঃস্মরণ করেছেন তাঁর হারানো দিনের আনন্দবেদনা-বিমিশ্র সুখ-স্মৃতি। শেষ-জীবনের 'গীতায়ন', 'গীতারঞ্জন' এবং 'গীতাশ্রী'-র মুমুক্ষু ভক্ত আমাদের চেনা কবি করুণানিধান নয়। 'শেষ-পসরা' 'চিত্রায়ণী' এবং অগ্রন্থিত কবিতাগুচ্ছের ভিতরে আগ্রহী পাঠক খুঁজে পাবেন মানুষ এবং কবি করুণানিধানের আর-এক বিমিশ্র পরিচয়।

কোথায় এই কবির কবিতার ত্রুটি, ভাবের অতিবিস্তার কবিতাকে সংহতি থেকে কোথায় ভ্রষ্ট করেছে, অত্যধিক ছন্দ-মনোযোগ তাঁর কবিতার শব্দ-শাসনকে কতখানি এলায়িত করে তুলেছে, এ-সমস্ত বিচার কবিতার ব্যবচ্ছেদকারী সমালোচকদের। আপাতত আমরা রূপ-অরূপের রসতন্ময় কবি করুণানিধানের এই নির্বাচিত কবিতা তুলে দিই রসগ্রাহী পাঠকের হাতে। একালের জমিতে দাঁড়িয়ে বিগত দিনের এই কবিকে তাঁরা নতুন করে আস্বাদন করবেন; দেখবেন এক স্বপ্নমুগ্ধ নিসর্গপ্রেমিক, রূপতন্ময় এক জীবনরসিক এবং ভক্তিপ্রণত আবহমান বাঙলার এক কবিকে। ছন্দকুশল এই স্বপ্ন-দেখা কবি শব্দকে বাজিয়েছেন তার বিচিত্র নিক্কণে; দেখিয়েছেন তার বহুকৌণিক দ্যুতি ও দীপ্তি। বাঙলা এবং ভারতের পথে-প্রান্তরে ঘুরে-বেড়ানো এই পরিব্রাজক কবি তাঁর চোখে দেখা রম্য দৃশ্য এবং মধুর শব্দগুলিকে বিচিত্র

রঙ-রূপ-ধ্বনিতে রণিত করেছেন তাঁর কবিতার বিচিত্র রূপবিভঙ্গে। এই সংকলনে লোকায়ত এবং লোকোত্তরের জোড়ে-বাঁধা তাঁর কবিতাগুলি অবশ্যই চিনিয়ে দেবে এই কবির ঐতিহাসিক গুরুত্বটিকে। কোথায় তাঁর ত্রুটি, কোথায় তাঁর সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা সে সব বিচারের ভার সমালোচকদের হাতে দিয়ে আপাতত আমরা রূপতন্ময় রূপতাপস করুণানিধানের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র এই সম্ভার তুলে দিলাম পাঠকের হাতে। একান্ত সাহিত্যপ্রেমী প্রকাশক ভারবি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসতে চাইছেন এইসব ভুলে-যাওয়া কবিদের—প্রকাশ করতে চাইছেন তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। আশা করি, কাব্যরসগ্রাহী পাঠকসমাজ একে আন্তরিক স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত হবেন না।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সুশান্ত বসু

সূ চি প ত্র

বঙ্গমঙ্গল (১৯০১)

কবিতার নাম	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
বন্দনা	অয়ি মাতঃ—বঙ্গভূমি "বনরাজিনীলা"	১৭
কোলাকুলি	মিলেছি ভাই আমরা সবাই	১৭
আশীর্বাণী	লভি অক্ষয়-আয়ু	১৮
মিলন	মায়ের দেউল উজল আজি আলোক-মালাতে,	১৯

প্রসাদী (১৯০৪)

কবিতার নাম	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
প্রবেশ	আজিকে আবাব দুরু-দুরু বুকে ঢুকেছি,	২১
ধ্রুব-ব্রত	আমারে অর্পিণু আমি মানবের তরে	২২
উষা	উদয়-সুন্দরী উষা, অয়ি অকুণ্ঠিতা	২৫
দিনান্ত মেঘে	আকাশের শেষে অবনীর শেষ	২৭
বালুকায়	নদীতীরে একা / বালুকা গনিতে-গনিতে	২৭
বৈশাখে	কলিকা ফুলের বাসে ভরিলে ভুবন	২৮
বর্ষায়	গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল,	২৯
আবাহন	এস গো আমার ভাবা আমার মোহিনী,	৩১
সুকুমার	দেখিলেই ইচ্ছা করে কোলে তুলে নিয়ে	৩২
দেবোদ্দেশে	জীবনে-মরণে, যাব তব পিছে-পিছে,	৩২

ঝরা ফুল (১৯১১)

কবিতার নাম	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
ঝরা ফুল	আজি দিব দেব, জীবনাঞ্জলি ঢালিয়া,	৩৪
বাসনা	ছুটিব আমি সরল প্রাণে	৩৫
রেণু	কথা আজো ফুটলনা দুষ্টুর,	৩৮
শেফালি	আর একবার বাতায়ন দিয়ে	৩৯
আষাঢ়ে	আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া	৪০
বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত	অথ, / বৈশাখের পর জ্যেষ্ঠ-আষাঢ়,	৪১
মনোহারিকা	বনফুলের বরণ-মালা	৪৪
হারা	চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন গাছের পাতায় ফাঁকে,	৪৫

বন্দনা	তব আরতির পূজা-উপচার সাজায়ে আজি	৪৬
সমর্পণ	ওরে মান কুড়াইয়া কি হবে?	৪৭

শান্তিজল (১৯১৩)

চিরসুন্দর	কুসুম-হারে সুতার-সম	৪৮
কাঞ্চন-জঙ্ঘা	নীল আকাশে বুলিয়ে তুলি	৫৩
অতীত	নাই সে সরল কিশোর বয়স	৫৫
ওয়াল্‌টেয়ার	মিনি সুতায় কে গেঁথেছে	৫৯
তন্দ্রাপথে	মেঘের পুরীর পর্দা তুলে	৬১
পথে	কে আজি মোর দোসর হবে	৬৪
শান্তি	মনের মাঝে নূপুর বাজে	৬৫

ধান-দূর্বা (১৯২১)

নব-বর্ষ	নব বরষের নবীন বাসরে মিলনের শতদল	৬৮
মঙ্গলগীতি	যেই ভারতের মহাভূমিতলে যজ্ঞের হুতাশন	৬৯
উন্মাদিনী রাই	ছুটিল যমুনা-কূলে উন্মাদিনী রাই	৭০
জীবন-ভিক্ষা	"দেউলে-দেউলে" কাঁদিয়া ফিরি গো,	৭২
প্রাণের ভাষা	অপমানে চূর্ণ কর আমার অহঙ্কার,	৭৪
বাঙলা দেশের মেয়ে	ননীর চেয়ে কোমল-হিয়া	৭৫
অশ্রু	পূর্ণিমা রাত, ঘুমিয়ে ছিলাম ঘাসের বিছানায়,	৭৭
হারা	তারি চুলের গোলাপ ফুলের	৭৮
বসন্ত-বিলাস	আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন-কোন রঙ ফুটল?	৭৯
লুকোনো ছবি	সেই কিশোরীর হাসির আলো খুঁজছি কাঁচা বয়স থেকে,	৮০
পূজার্থিনী	কোন মহাকাল-মন্দির-পথে	৮১
স্নেহলতা	সঙ্গোপনে গৃহের কোণে	৮২
মাতৃস্তোত্র	কিরণে-শিশিরে-কুসুমে-ধান্যে তরুণী.	৮৩
দোল-স্বপ্ন	চাঁদের রঙে ডুবিয়ে আঁচল,	৮৫
শেষ	কারা যেন আসে সরে	৮৮

শতনরী (১৯৩০)

ফিরে চাওয়া	নতুন চাওয়া চাওগো ফিরে এই চাওয়া কি শেষ চাওয়া?	৮৯
সে	ওগো মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলিয়ে কে—	৮৯
দুমকারানী	পাহাড়ঘেরা বাঁধের তীরে পথ ফুরাল শেষরাতে	৯০
পঞ্চকোটে	ফিরিয়া এসেছি ফের সেই দারুকেশ্বরের স্বপ্নময় তীরে,	৯৩
অমিতাভ	নমি অমিতাভ বুদ্ধ-বিভূতি হে মূর্ত ত্যাগ করুণাময়,	৯৪

রবীন্দ্র-আরতি (১৯৩৭)

রবীন্দ্র-আরতি	জয়ন্তী প্রতিভাচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া, বিশ্ব চমকিয়া,	৯৬
ত্রিকূটে	বোধন-বীণ, বেদের সাম	৯৮

বাহু	সুন্দর তব ভুজান্তর লাগ ফুটেছে যৌবনে,	১০০
প্রবাসী	বনের পাখিরে ধরে যতনে আদর করে	১০১
আবছায়ায়	জলের পারে ঝাউয়ের সারি	১০২

শতনরী : দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৪৮)

সাঁঝের সুরে	কুহু-স্বরের মিঠা জবাব দেয় যে উড়ো হরবোলায়,	১০৪
ক্ষ্যাপার গান	সোনার থালা গিনির মালা ভালোবাসার ভান,	১০৫
মরীচিকা	হয়তো ভালোবাসতে পারে কেউ কাহাকে কভু	১০৮
সঙ্কল্প	স্বার্থ-অসির ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখে-সুখে টলব না,	১০৯

শেষ পসরা [অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত কবিতা]

বুড়ু-মা	আমি বড় ভালোবাসি	১১০
মনুয়া	সোনার দোলন চাঁপার কুঁড়ি, কি লাবণি অঙ্গরাগে,	১১১
বাণু	মোদের মুখের ছোট্ট ফটো	১১২
ডাক	পান্থ-পাদপ বল্কলেতে কুঠার হানিয়ে,	১১৩

অগ্রন্থিত কবিতা

আবাহন	দেবী। / অলির পাখার চরণ-নূপুর গুঞ্জরি,	১১৫
পাগলের গান	ওগো সেকি মোর হবেনা	১১৫
চল্ ছুটে চল্	ওরে ক্ষিপ্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে মহাবল	১১৭
মুক্ত	নীলিমার পানে চেয়ে আজ মনে হয়	১১৮
পদ্মা-তটে	সোনার ঝলকে শরতের দিনে	১২০
গাছ ও মালী	গাছ বলে, মালী ভাই কেন ছাঁট মোরে?	১২০
বর্ষ-মঙ্গল	নবীন বরষ, নবীন উষায়	১২১
পথের সুর	ডাকে দূর গহন দীর্ঘ পথ	১২২
হোলি	আজি বৃন্দাবনী ফাগুয়া রাগে রাঙিল পরান,	১২৩
আগমনী	এস মা শক্তি এস মা সিংহ-বাহিনী,	১২৩
বলা-শেষ	মনের কথা রইল মনেই বন্ধু মোর,	১২৫
মানুবালা	ইকড়ি-মিকড়ি-চাম চিড়কি	১২৬
কুড়ানো পাতা	পুরানো খাতার কুড়ানো পাতার কথা,	১২৭
রুশু	আমার মুখের ছোট্ট ছবি	১২৮
মোহন-বাগান	জেগেছে আজ দেশের ছেলে,	১২৮
বাণী	যে তপন অস্তমিত উজ্জ্বলিয়া অতীতের	১৩১
নির্বাসিত	নহে নহে নহে, নির্বাসন।	১৩২
পাড়ি	মাঝ-আকাশে পাড়ি দিয়ে পৌঁছিল চাঁদ	১৩২
নতুন দোলা	অনেক জিনিস উপহার দিয়ে সখা ও সখীরা সবে	১৩৪

বন্দনা

অয়ি মাতঃ— বঙ্গভূমি "বনরাজিনীলা",
স্বচ্ছ-সরিৎ—শীতলা পল্বল-পঙ্কিলা,
শান্ত সীমন্ত নীলাভ্রে অবগুণ্ঠিত,
প্রান্তরে-প্রান্তরে কুসুমাঞ্চল লুণ্ঠিত
স্তন্যদাত্রি, বোধ-ধাত্রি,
অয়ি অতুলনা মা তুমি-
কুঞ্জে-কুঞ্জে তব কোবিদ-বীণা ঝঙ্কৃত,
অয়ি চিরসুন্দরী নিরলঙ্কৃত,
অয়ি অমল-ইন্দু-কিরণ-সিন্ধু,
করুণাময়ী মহিলা!

কোলাকুলি

মিলেছি ভাই আমরা সবাই
মায়ের মুখের পানে চেয়ে,
মায়ের সেবায় মিলেছি ভাই
কোলাকুলি ভায়ে-ভায়ে।
এসেছি আজ খেলা ছেড়ে,
উঠেছি ভাই ধুলা ঝেড়ে,
বসেছি আজ মায়ের ক্রোড়ে
মায়ের অপার-অগাধ স্নেহে।
জননীর জয়-পতাকা
তুলেছে ওই তালের শাখা।
মায়ের হাতে ঢাকাই শাঁখা—
মা মোদের আদুরে মেয়ে।
মায়ের বিনোদ-বেণী ঘিরে

তরুলতার শিরে-শিরে
থরে-থরে মেঘের শোভা
মায়ের সিঁথি সোনায় ছেয়ে।
চোখ ফেটে মা জল যে আসে
শুয়ে মা তোর নধর ঘাসে,
তোমার ওই সুনীল সুদূর
আকাশপানে চেয়ে-চেয়ে।
দুকূলে তোর কুসুম আঁকা,
রঙ-ফলানো পাখির পাখা,
ধানের ক্ষেতে সোনার চেলি
পবনে যায় ঢেউ খেলিয়ে।
এই হৃদয়ের শোণিত ঢালি
ধুইব তোর মনের কালি,
মানুষ হয়ে উঠেছি আজ
মা তোর মধুর স্তন্য পিয়ে।

আশীর্বাণী

লভি অক্ষয়-আয়ু
মুঠায় আঁকড়ি ধর এ ধরণী
আকাশে বাড়াও বাহু।
ধাও উদ্দাম গতি,
ঝঞ্ঝার মতো ধাও আনন্দে
নীল অম্বুধি মথি।
শুভ্র পক্ষ মেলি
বাড়ব-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়
দুর্যোগ অবহেলি।
যাচ সিন্ধুর কাছে,
রতনের খনি মৈনাক-মাঝে
অনেক মানিক আছে।
লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।
বর্শা শানায়ে নিয়ে

অশ্বের ক্ষুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের পাশ দিয়ে।
এস গো দুঃসাহসী,
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী।
উত্তাল গিরি-চূড়া
ভীম বিক্রমে দৃঢ় পদাঘাতে
স-দর্পে কর গুঁড়া।
ধাও অবারিত গতি,
সুনীল আকাশ মুক্ত বাতাস,
সতেজ-স্বাধীন মতি।
হও একরোখা গোঁয়ার
ঢেউ গুনে-গুনে কাটিও-না দিন
কখন আসবে জোয়ার,—
কখন উঠবে হাওয়া,—
মিথ্যে আশায় পথ চেয়ে থাকা
আকাশের পানে চাওয়া!
সাধিতে হইবে মন্ত্র,
গ্রাহ্য করো-না কারা-দণ্ড বা
বৈরীর ষড়যন্ত্র।
আজি যৌবন-প্রভাতে
উর্জস্বল পৌরুষভরে
সত্যসন্ধ শোভাতে
কর-কর দ্বার মুক্ত
ন্যায়ের দণ্ড প্রোথিত করিয়া
হও ভাই জয়যুক্ত।

মিলন

মায়ের দেউল উজল আজি আলোক-মালাতে,
ছেলেবুড়োয় গলাগলি পথের ধুলাতে।
এমন দিনে ঘরের কোণে কেবা আছিস রে,
আয় রে ছুটে মাকে যারা ভালোবাসিস রে—
সাজিয়ে নে আয় রক্তকমল পূজার ডালাতে।

হাটে-হাটে ঝলসে ওঠে অরুণ শিখা রে।
পর মায়ের চরণরেণু রাজার টিকা রে।
আয় ভিখারির ঝুলি ফেলে শিল্পশালাতে।
অলস যারা ঘুমিয়ে ছিল পল্লী-আড়ালে
তারাও আজি আপনা হতে বাহু বাড়ালে ;
ছুটল স্বপন তপন-ছটায় প্রভাত-বেলাতে।
হাজার আঘাত করুন রাজা তফাত রাখিতে,
ভাই কি কভু ভাইকে ছেড়ে পারবে থাকিতে?
মিলল আসি বাংলাবাসী একটি মেলাতে।
একলা নহি—অর্ঘ্য বহি আসছে লাখো ভাই,
জনতা ওই বাড়ছে পিছে, এগিয়ে চল, যাই ;
লজ্জা-গ্লানি জ্বালিয়ে নে রে বজ্রজ্বালাতে।

প্রবেশ

(কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর উদ্দে

আজিকে আবার দুরু-দুরু বুকে ঢুকেছি
হে কবি, তোমারি দুয়ারে,
মোহন তোমার সুরভি-পুরীতে
মণি-মরকত-ভরা মাধুরীতে
পশিয়াছে দীন সঙ্গীতহীন
আজি বাসন্ত জোয়ারে।

শিহরি-শিহরি কাঁপিতেছে স্নায়ু-ধমনী
মুগ্ধ দিবস-রাতিয়া—
কত হাসি হাসে মল্লিকা-যূথী,
চম্পা, চামেলি, মাধবী, সেঁউতি,
সুখ-দখিনায় কণায়-কণায়
মাতাল আশায় মাতিয়া।

ওই ডাকে পিক পলাশ-শাখায় গুমরি
ফাগুন-আগুন পুড়িয়া।
কুসুমের ঢেউ ভরিয়াছে বন,
চমকে চকিতে আনমনা মন,
এসেছে প্রভাতী আলোর তুফান
চারু-চরাচর জুড়িয়া।

তাই আসিয়াছি তব মালঞ্চে হে কবি,
মার্জনা কর এ দাসে,
পাই যদি কিছু নূতন গন্ধ,
নূতন মন্ত্র, নবীন স্পন্দ,
নূতন সুরের নূতন সরণি
প্রাণের উতল উচ্ছাসে।

মুরলীতে মোর প্রাণপণ হৃৎপবনে
ফুলিয়া উঠেছে সাহানা।
সন্ধ্যার চুলে জমে সোনা-মেঘ,
'মুরলা'র কূলে মরে জলবেগ,—
সুদূর আঁধারে জমিয়া গিয়েছে
কবির জীবন-মোহানা।

আজকে অতিথি তোমার ভুবনে,
তোমার সোনার খনিতে,
ওইখানে পাব চিরবাঞ্ছিত,
জীবনের জ্যোতি পুলকাঞ্চিত,
হোথায় শুনিব সোহাগ-রাগিণী
হৃদয়-শোণিত-ধ্বনিতে।

এসেছে সেবক, নব-নিবেদক, কবিবর,
কলকোলাহল ঘৃণিয়া ;
দাঁড়িয়েছি এসে বালির ডাঙায়,
অস্ত-রবির রঙিন রাঙায়,
মনের মতন মিলেছে হোতায়
ছায়াপথে পথ চিনিয়া।

ধ্রুব-ব্রত

আমারে অর্পিণু আমি মানবের তরে
মানবের শুভব্রতে। ধরণীর ঘরে
যাহারা অতিথি আজ, হবেনা ব্যথিত
তাহাদের ক্লান্ত বক্ষ, রবেনা চিহ্নিত,
তাহাদের শ্রান্ত স্মৃতি মোর কোনোও কাজে,
মোর কোনো কোলাহলে। চরাচর-মাঝে
আমারে ছড়ায়ে দিব। গৃহের দুয়ারে
মৌন মরিবনা হেথা। উষ্ণ অশ্রুধারে
শুধু মোর ক্ষুদ্র দুঃখ, তুচ্ছ শোকগাথা
সিক্ত করিবনা বৃথা।

ওই যে অনাথা
।পিতৃহীন, শীর্ণম্লান শিশু সুকুমার
কুশল-কল্যাণহারা,—উৎসবের দ্বার
রুদ্ধ যাহাদের স্পর্শে, ভালোবাসিবার
কেহ নাই সংসার-মরুতে, আপনার
করে লব ওই প্রাণকণা। গৃহদ্বার
অবারিত করে দিব ; ওরা যে আমার।
অসহায়ে, নিরুপায়ে আনিব ডাকিয়া।
এই সুখ, এই তৃপ্তি।

জীবন রাখিয়া
জীবনের বিসর্জন! মানব-মঙ্গল,
জীবন-মঙ্গল ব্রত। পূর্ণিমা-উজ্জ্বল,
উচ্ছল উর্মির মত চূর্ণ মর্মস্থল
এ বক্ষ-কঙ্কাল-তটে। দীন দুরবল
শক্তি যাচে, কোথা তুমি জগতের স্বামী,
আমার সর্বস্ব, সখা! কি করিব আমি!
ধর এই ক্ষীণ হাত।

আকুল আঁখিতে
এমনি দেখিব চেয়ে দিবসে-নিশীথে
পৃথিবীর প্রতি বাতায়ন, তরুতল,
গিরি, দরী। আমারে কে করেছে বিকল,
সকল-বন্ধন-মুক্ত। এ সোনার সাঁঝে
চলিয়াছি নিশিদিন অতিথির সাজে
দুয়ারে-দুয়ারে ওগো—কোথায় কে আছে,
বুঝাব আমার তৃষা সকলের কাছে।

বিফল হবেনা জন্ম—কর্তব্যের ব্রত
আহ্বান করিছে সবে। শুধু অবিরত
তুচ্ছ আত্মসুখ নিয়ে অভিমান-ভরে
কেন বদ্ধ মনভার সোদরে-সোদরে?—

আপনার অন্তঃনেত্রে দেবতা ভাবিয়া
যারে পূজিয়াছ তুমি প্রাণমন দিয়া,
সে কেন সম্ভাষে হায় উপেক্ষার স্বরে?

হৃৎপিণ্ড ছেদন করে নির্দয় অন্তরে?
তবু, তবু প্রেমভরে সহ অহরহ
পুণ্যের যা পুরস্কার, দুঃখ ভয়াবহ
নির্বিকার কুণ্ঠাশূন্য মনে। ঢেকে দাও,
প্রেম দিয়া ঢেকে দাও যাহা কিছু পাও,—
ঘৃণা-দ্বেষ-নির্যাতন ; দুঃখ দাহে দহ,
ভালো-মন্দ বিচারের তুমি কেহ নহ।

হে বন্ধু, এখানে কবে পূরে মনস্কাম?
সুখের পিছনে ছোটা, সুখ তারি নাম!
সুখ? সে তো মরীচিকা। আছে ওই আছে,
পিয়াসায় ছুটে যাও—পাইবেনা কাছে।
প্রেমে সুখ, ত্যাগে সুখ, সুখ দিয়া-নিয়া ;
চাও সুখ, পরিহর সব সুখ-স্পৃহা।

ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয় মোর, পুণ্য-প্রেমে
পবিত্রিয়া মনপ্রাণ আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেমে
সাধিতে হইবে নিত্য সিদ্ধি উচ্চতমা
হৃদয়ের উদ্বেল স্পন্দন-সাথে। ক্ষমা
প্রতিপদে চতুর্দিকে হইবে সিঞ্চিতে
অবনী অমল করি। নিয়ম-সংগীতে
লক্ষ বিশৃঙ্খল চিত্ত দুর্জয়, দুর্দম
সংযমিতে হবে ঐক্যে। লক্ষ ব্যতিক্রম
নিয়মে বাঁধিতে হবে।—ধ্রুবের উদ্দেশে
চেয়ে আছি আশাপথ। কখন কে এসে
পূরাবে বাসনা-তৃষ্ণা। বৃহৎ আশায়
সে করেছে মহীয়সী মোর আত্মতায়।
আমার দেবতা, বন্ধু, তোমার দেবতা
তুমি যারে ভালোবাস। তাহারি বারতা
তন্ময়-তন্ময় হয়ে, শুনিয়াছি আমি—
আমারে তোমার করে লহ অন্তর্যামী।—

লও লও সব লও, সকলি তোমার,
গচ্ছিত ফিরায়ে লও হে প্রভু আমার।
দিয়াছ যে পরসাদ, হে করুণাময়,
আমার কি সাজে তার কণা-অপচয়?

আমি যে—আমি যে, পিতঃ, তোমারি সন্তান,
এই চিত্ত-মন্দিরে তোমারি অধিষ্ঠান।
আনন্দে দেখিব চেয়ে যাহা কিছু আছে
নিখিল নিলয়ে। ওগো, নাহি মোর কাছে
কিছু তুচ্ছ, কিছু ঘৃণ্য, বীভৎস, কুৎসিত।
সকলে মিলিয়া হেথা সৌম্য, সঞ্জীবিত
অসীম সুন্দর এক, এই বিশ্বরূপ।
তুমি-আমি অংশ তারি, সৌন্দর্যের স্তূপ!

দেখ, বুকে হাত দিয়া প্রাণের স্পন্দন
অন্তর্যামী। এস প্রিয়, আমরা দুজন
এ ব্রত গ্রহণ করি। পূর্ণ-মনোরথ
জানিনা হইব কিনা! দীর্ঘ এই পথ।
সবারে বাসিয়া ভালো হে নিখিল-স্বামী
মরিবার অধিকার পাই যেন আমি।
এই মোর ধ্রুব-ব্রত। এই মোর সব।
পূজা-অর্চনায় তব এই মন্ত্র-স্তব।

উষা

উদয়-সুন্দরী উষা, অয়ি অকুণ্ঠিতা,
পুণ্যশুভ্রা সুকুমারী মহিম-মণ্ডিতা,
কি দেখিছ দাঁড়াইয়া পূর্বের পর্বতে
উন্মীলি নলিন নেত্র? অমৃতের স্রোতে
প্লাবিয়া এ চরাচর? দেখিছ কোথায়
পুষ্পেরা পেতেছে শয্যা—তুমি শুধু তায়
চরণ ফেলিবে বলি। সম্ভাষে তোমারে
কোয়েলা আকুল কণ্ঠে কুঞ্জের দুয়ারে
প্রথম জাগ্রত। আমাদের এই গৃহে
দূর অমরার আভা দাও প্রসারিয়ে
অসংখ্য রশ্মিতে। ওই নীলাকাশ-তলে
প্রসন্ন সুষমা-গর্ভে শান্ত কৌতূহলে
দাঁড়াও করুণাময়ী ; এই অচেতন,
অনাদি নিদ্রার সিন্ধু করহ মন্থন

কঠোর কর্তব্য-দণ্ডে ; এই মৃত্যুহিম,
বিবর্ণ এ অবয়বে জীবন-রক্তিম-
চ্ছটা দাও হিমোগ্লোবিয়া—উজ্জ্বল প্রভাতে
তৃষা যেন পূরে তব স্নেহ-বিন্দুপাতে।

নিশীথের মৃত্যুপ্রান্তে নব-জন্মে আজি
জনতার তীব্র তূর্য উঠেনাই বাজি
এখনো এখানে দেবী। জ্যোতির ঝঙ্কারে
তরঙ্গিত তারা-স্তোম। উদাত্ত ওঙ্কারে
মর্মরিত অরণ্যানী—ঝরে রত্নঝারি,
কি সুন্দর! চেয়ে দেখ, জাগ নর-নারি।

প্রথম রূপসী তুমি সৌন্দর্যের খনি
অশেষ ঐশ্বর্যময়ী। সীমন্তের মণি
জ্যোতির্ময়ী দিবা-বালিকার। সবিতার
নর্মসখী, এস নেমে, গাঁথ ফুলহার
ধরণীর বনে-বনে। আকাশ-প্রেয়সী,
করো দীনা বসুধারে সৌম্যা মহীয়সী।

বিধাতার অতুলনা মানস-দুহিতা
দাঁড়াও মুহূর্ততরে, দোহন-উত্থিতা
সুধা-সুমধুর গীতি শোন একবার
ওই শষ্পশ্যাম গোষ্ঠে, পল্লী-বালিকার
রণিত কঙ্কণচ্ছন্দে। এ শুভ উৎসবে
এস আজি হাসিমুখে এস সগৌরবে,
সীমাহীন সমারোহে ; নির্মম মানবে
হাসিতে শিখাও তুমি আলোক-সম্ভবে,
মূর্তিমতী প্রসন্নতা। কলঙ্ক-কালিমা
স্পর্শিতে না পারে যেন ধরণীর সীমা।
এস উষা, এস প্রমা, এস ধ্রুবালোক ;
পৃথিবীর পরমাণু প্রকম্পিত হোক।

দিনান্ত-মেঘে

আকাশের শেষে অবনীর শেষ ;
মেঘের ওপারে শ্রান্ত দিনেশ,
এলাইয়া পড়ে সন্ধ্যার কেশ
দখিনায় দুলে-দুলে।
শোভায়-শোভায় আভায়-আভায়
ঢেউয়ের উপর ঢেউ খেলে যায়,
হিঙুল বরন ঢাকিছে সোনায়
দূর পাহাড়ের কূলে।

মেঘের প্রান্তে জ্বলিতেছে হীরে,
জ্যোতির ভিতরে জ্যোতি পড়ে চিরে,
কি ফুল ফুটেছে শিখার শরীরে
মেঘের রন্ধ্রপথে!
রকতে-রজতে-কনকে-কাজলে,
মিশেছে উদারে-মধুরে-উজলে,
ভাসে শত জবা যমুনার জলে,
ছোটে তুরন্ত স্রোতে।

নিবিল সহসা কাঞ্চনী-শিখা,
কে গেল ছিটায়ে মসীর কণিকা—
নবীন-নিবিড় নীল যবনিকা
আধেক ঢাকিল সবি।
শূন্য নয়ন পূর্ণ ভরিয়া
আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া—
পাগল পরান পাগল করিয়া
ডুবিল সন্ধ্যারবি।

বালুকায়

নদীতীরে একা
বালুকা গনিতে-গনিতে
চমকিনু আমি
তোমারি চরণ-ধ্বনিতে।

শীর্ণ জানুতে
শ্রান্ত ললাট রাখিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছি
তোমারে ডাকিয়া-ডাকিয়া।
কত পরীক্ষা,
কত প্রতীক্ষা সহিয়া
শত যুগ আঁখি
রয়েছে শুষ্ক হইয়া,
ধূসর মরুতে
চলিয়াছি আশা আঁকিয়া,
বালুকায় লেখা
বালুকায় যায় ঢাকিয়া।

বৈশাখে

কলিকা ফুলের বাসে ভরিলে ভুবন
কে ভুলিবে তোমার আনন?
রে দখিনা বায়ু ক্ষ্যাপা, বিশাখা ফুটায় চাঁপা,
তুই কি বুঝিবি তার নির্লিপ্ত চুম্বন?
বৈশাখে বিনোদ-শোভা মধুর ভুবন।

কে পরাবে বরমালা প্রিয়ার গলায়
মুঞ্জরিত মালতী-দোলায়?
দুইজনে চোখ বুজে দু-জনায় মরে খুঁজে
কে কাহারে ধরা দিবে তমাল-তলায়,
পরাইবে ভুজডোর প্রিয়ার গলায়।

একটি হইয়া গেছে যুগল হৃদয়,
আর কিছু, কিছু যেন নয়।
পৃথিবীতে সব আছে, তার কিছু নাহি কাছে
সব দুরিয়াছে দুঁহু মনোবিনিময় ;
নাহি কাজ, নাহি লাজ, নাহি মান-ভয়।

ম্লান হয়ে এল আলো আকাশের গায়,
চূর্ণ অভ্র রঙিন সোনায় ;

ফুরাল পূরবী সুর করুণায় সুমধুর ;
উঠিল জলের রব অদূর গঙ্গায়,
তুমি আরো সরে এস সাঁঝের ছায়ায়।

সরে এস, কাছে এস, আঁখির পরশে
মিশে যাই তোমার পারশে—
নিখিল এ বসুধার দুরূহ জীবনভার
অমৃতে হউক স্নিগ্ধ তোমার উবসে,
কৌমারের, যৌবনের, প্রৌঢ় বরষে।

বর্ষায়

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল,
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—
বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসেনাকো হাট,
সারাদিনরাত বৃষ্টির ছাট
ঝরিতেছে একঘেয়ে।

ভাসিল পুকুর আউশের ভুঁই,
পালায় কাতলা, কালবোস, রুই,
আঙিনায় জল করে ছল-ছল,
ব্যাঙ ডাকে, হাঁস চরে।
কাঁঠালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস।
গাছভরা জাম সুচিকন শ্যাম
ফেটে যায় রসভরে।

ভিজে-ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই ;
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই ;
চলে গেছে চিল গগনের নীল
গলে গেছে জলধারে।
রাঙা আঁখি মেলি আনারস-রাজ

পরিয়াছে শিরে মরকত তাজ।
সেব্বর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দনদিঘিপারে।

মেঘমন্থর জল ঝরঝরে
যত কেয়াঝাড় ফুলে গেছে ভরে,
বেধেছে সমর মধুপে-ভ্রমরে
মধু-লুণ্ঠন লাগি।
পাতার প্রান্তে খর কণ্টকে
পাখা কাটাকাটি অলির কটকে,
কান্ত কঠোর কুসুম-তোটকে
পরাগের ভাগাভাগি।

যূথী-মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি,
মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি,
ধুলাকাদা-মাখা পাপড়িতে ঢাকা
কামিনী-তরুর তলা।
দূর-নির্জনে তমালের ডালে
শ্যামলা মালতী সুধাধারা ঢালে,
বন-তমালের কানে-কানে তার
কি কথা হলনা বলা।

এতদিন ধরি বলি-বলি করি
যে কামনা বুকে রয়েছে গুমরি
আজি সমাদরে অধরে-অধরে
তাহা কি জানাতে পারি!
জাগাতে পারি কি মৃদু গুঞ্জন,
চারু-চুম্বন, সুধা-ভুঞ্জন?
হে বঁধু, আজি এ মধুর বাদলে
মন সামালিতে নারি।

আজি এ আঁধার আর্দ্র-বাসরে
যে-জনা যাহারে চাহে অন্তরে,
সে তাহারে দিক আশার অধিক
অমর সোহাগ-সুধা;
বুকের নিকটে নিক তারে টেনে,
চুম্বন দিক কোলে তুলে এনে,

চিরজনমের প্রিয়জন জেনে
মিটাক প্রাণের ক্ষুধা।

বাদলা হাওয়ায় বুকে ওঠে ঢেউ,
এ ঢেউয়ে ডুবিতে নাহি কি গো কেউ?
উদাসীন প্রাণ করে আনচান
কারে যেন দিতে ধরা।
দেখেছিনু তায় সোনার উষায়,
ডেকেছিনু তারে আঁখির ভাষায়,
ভোর হয়ে দোঁহে সুখের নেশায়
হেরিতাম মেঘ-করা।

বিজলি-ঝলসা নীচোল-প্রান্তে
পথ দেখাত সে এ-দিগ্‌ভ্রান্তে ;
উজ্জ্বল তার উচ্ছল আঁখি,
ক্ষীণ-কজ্জল ভুরু।
আজি দুর্যোগে ভরা বরষায়
পথ চেয়ে আছি তারি ভরসায়,—
ওগো, জল-কলরবে মিলাইয়া যায়
হৃদয়ের দুরুদুরু।

আবাহন

এস গো আমার ভাষা আমার মোহিনী,
সুখে-দুখে মুখরিত এ মৌন আলয়ে,
এ শুভ-শ্যামল-কুঞ্জে কনককিঙ্কিণী
শিঞ্জিয়া উঠিনি কভু বাজিনি বলয়ে।
তুমি হেথা আন সখী প্রথম ঝঙ্কার,
সা-রে-গার সুমধুর চিকন গাঁথনি,
তুমি হেথা গাঁথ কথা-কুসুমসম্ভার
দোলাতে বঁধুর গলে হে কবি-রমণী।
এখানে এ মূক বনে গোপন কুলায়ে
জাগুক তোমারি কণ্ঠ, সোহাগিনী মোর,
তোমারি মঞ্জীর-ছন্দ আমারে ভুলায়ে

ঢাকুক সকল ছন্দ অনুপ্রাস-ডোর।
সর্বার্থ-সাধিকা হয়ে থাক মনোচোর,
মদির করুক মোরে তোমারি আদর।

সুকুমার

দেখিলেই ইচ্ছা করে কোলে তুলে নিয়ে
রাখি বুকে চেপে ধরে, থাকি মাতোয়ারা ;
হাসিভরা রাঙা ঠোঁটে চুমু দিয়ে-দিয়ে,
সে শুষে নিয়েছে মোর স্নেহের ফোয়ারা।
কচি তার বাহুদুটি গলায় পরিয়া,
সে কালো কাজল চোখে দেখিব দেয়ালা
খেলিব চম্পক-কলি অঙ্গুলি লইয়া—
ভরিয়াছে সে আমার প্রাণের পেয়ালা।
জমায়ে কোমল জ্যোৎস্না চম্পকের রাশে,
এনেছে লাবণ্য-বন্যা সে আমার গৃহে ;
কুন্দ-দন্তে অফুরন্ত হাসির উচ্ছ্বাসে,—
ভুবন ভুলেছি আমি তারে কোলে নিয়ে।
কালো চোখে পেয়েছি যে পারিজাত-সুধা,
শতযুগ পিইলেও মিটিবেনা ক্ষুধা।

দেবোদ্দেশে

জীবনে-মরণে, যাব তব পিছে-পিছে,
তনু-মনঃ-প্রাণ তব পদে লুটাইছে
দিবস-যামী।
তোমারি চরণ-চিহ্নিত পথে
দূর নির্জনে, দেব, সাথে-সাথে
রহিব আমি।
ওই যে ঝরিছে কদম-কেশর
ইন্দ্রধনুর বরনের স্তর
অম্বর আলো করিয়া,-

সম্মুখে আমার দাঁড়ায়েছ, দেব,
অমৃতে নেত্র ভরিয়া।
কোথা ছেড়ে যাবে ধ্রুবতারা মোর,
নিখিল-স্বামী?
সকল হৃদয় লুটায় ও-পায়
দিবস-যামী।
অবারিত মাঠে নীল আকাশেব তলে
তোমার আবতি করিব আঁখির জলে
জানিবে কেবা।
আমার যা কাজ, আমার যা ব্রত
করিব শুধু গো হয়ে অবনত
তোমারি সেবা।
শীর্ণ তটিনী গান গেয়ে যায়
মালতী-ললিত বকুল-তলায়
মালা গাঁথে বালা সখার গলায়
পরাবে বলে—
দেখিনাই ফিরে, পিছে-পিছে তব
এসেছি চলে।
মনে পড়ে সেই সন্ধ্যায় কবে
রবির আবির ফুরাইলে নভে
বনের পাশে
কিরণ-রচিত শরীরে তোমার
গুচ্ছ-গুচ্ছ দোলে ফুলহার
মৃদু বাতাসে।
নিবে-আসা দিন ধূসর-মলিন,
পূরবীর তান মুরলীতে লীন,
মন্থর শশী আকাশে,
শুভ্র মেঘের আঁখি উৎসুক
জ্যোৎস্নার সুধা-তিয়াসে।
ছায়ার মতন মিলাইলে, প্রিয়, সহসা কোথা,
ফুরালনা আর এ পথহারার প্রাণের ব্যথা।

ঝরা ফুল

আজি দিব দেব, জীবনাঞ্জলি ঢালিয়া,
চিত্ত-দেউলে 'পঞ্চ-প্রদীপ' জ্বালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে
রহিয়া-রহিয়া গো।

মেঘ-সীমন্তে চন্দ্রকান্ত ফুটায়ে,
ইন্দ্রধনুতে রঙিন প্রাবার লুটায়ে,
ভূধর-সোপানে ময়ূর-কণ্ঠ
ময়ূখে এস হে নামিয়া।

বহাও ভুবনে ভাবের অলকনন্দা,
আসুক ভাসিয়া দিব্য যোজন-গন্ধা,
নন্দন-ঝরা পারিজাত-রাজি,
মন্দার-অপরাজিতা,—
তুলি হিল্লোল পরাগ-সাগরে
এস স্বর্লোক-সবিতা।

রত্ন-প্রবাল স্যন্দনে ব্যোম আন্দোলি,
দীপ্ত কিরীটে 'আকাশ-গঙ্গা' চঞ্চলি
হে বুধোত্তম, এস ভক্তের
হৃদয়োৎপলে নামিয়া,—
কাঞ্চন-ছটা ধূর্জটি-জটা
ঝরুক গলিয়া-ঢলিয়া।

কবে কোন দিন মধু-চন্দ্রিকা-ক্ষীরোদে,
যোগাসন তব হেরিব কুন্দ-নীরদে?—
এ 'একতারা'য় কর্কশ-রূঢ়,
গিটকিরি যাবে থামিয়া।

তব পদতলে হৃদয়-অগুরু জ্বালিয়া
ঝরা ফুলে ভরা ডালি দিনু আজি ঢালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে
বহিয়া-রহিয়া গো।

বাসনা

ছুটব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটির হতে,
ধান নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুটব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগবে দূরে,
কান জুড়াবে পাখির গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ করে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার কাটা,
নাচবে আলো জলের বুকে,
নীল আকাশের তলে।

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব নায়ে,
মাঝগঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস-আদুল গায়ে ;
গাঙচিলেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে
উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাকবে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে-ছায়ে।
বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী';

কদম-কেশর শিউরে উঠে
পড়বে ঝরি ঝরি।
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে' ঢাকা
কেয়া-ঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়ায়ে বাঁধব মোয়া,
লাঙল দেব ভুঁয়ে,
কড-কড়-কড় ডাকবে দেয়া,
আসব আমন রুয়ে।
আকাশ-ভাঙা মুষলধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড,
পাকুড়-তেঁতুল-ঝাউয়ের ঝাড়
পড়বে নুয়ে-নুয়ে।

তলতা বাঁশের ছিপটি হাতে,
ছাতিম-তলার ঘাটে
রইব বসে রৌদ্রমাখা
বৃষ্টিজলের ছাটে ;
'চারে'র মিঠা গন্ধে উতল
উঠবে ভেসে রোহিত-চিতল,—
উড়িয়ে 'ঢাউস' গ্রামের ছেলে
মিলবে খোলা মাঠে।

অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে
দেখব দুপুর-বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়
পাখির সাঁতার খেলা।
কাঠঠোকরা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি করছে গভীর,—
পাখায় রঙের মেলা।

কাঠ-বিড়ালী বেড়ায় ছুটে
রান্নাঘরের চালে ;
জিহ্বা মেলে ধুঁকছে 'ভুলো'
সামনে ঢেঁকিশালে।

গাছভরা ওই পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা পড়ছে ঢুলে,
রয়ে-রয়ে দোয়েল ডাকে
বাবলা-গাছের ডালে।

কামার-শালে বসব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি,
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টানব জাঁতার দড়ি ,
ঝুলের কাছে জমবে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে নেয়াই পিটব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-জুঁই—
আলোর ছড়াছড়ি।

শুনতে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গলবে মনপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা
শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা,
ফিরব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর আগবাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি ফুল খোঁপায় পরে
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষুদুটি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি
'ফণী-মনসা'র বেড়ায়-ঘেরা
'দুর্গা-দিঘি'র ধারে।

শিউলি ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে,
জ্যোৎস্নাধারা পড়বে ঝরে
দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি দুধের সরে
ঘাটটি হতে ঘটটি ভরে,

সইয়ের সাথে গৃহিণী মোর
আসবে ফিরে ঘরে।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা,
শিথিল আঁখির প্রান্তে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব যাতে।
না ফুটিতেই উষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখি,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'
প্রাণের একতারাতে।

রেণু

কথা আজো ফুটলনা দুষ্টুর,
কিন্তু যেটি করতে বলো করে,
কণ্ঠ বেড়ি ছোট্ট দুটি হাতে
ঠোঁটের পাশে ঠোঁটটি তুলে ধরে।

দৌড়ে আসে দেখবামাত্র মোরে,
উড়িয়ে দিয়ে কোঁকড়া কালো চুল
সে যে আমার প্রাণ-মৃণালের কমল,
সে যে আমার স্বপন-পুরীর ফুল।

সে দেয় ভেঙে নীল আকাশের গুমর,
চটুল চোখে দীপ্ত সজল হরষ ;
দুধের রেখা-আঁকা অরুণ অধর
বুকের মাঝে দেয় রে সুধা-পরশ।
একটি রাতে ফুলিয়ে আঁখিদুটি
ঘুমায় বাছা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে,
শিথানে তার জ্যোৎস্না পড়ে ফুটি—
অভিমানে বুকের ভিতর বেঁধে।

রথে-কেনা ডুগডুগিটি রাঙা
পড়ে আছে আলমারিটির কাছে,

চীনের পুতুল, টিনের বাঁশি ভাঙা,
শোলার পাখি ধূলায় লুটাতেছে।

দিলাম চুমু, রাত্রি তখন অনেক,
আস্তে-আস্তে মুখটি করে নিচু,—
অপার্থিব সুধায়-গড়া 'রেণু'র
অধর-পুটে পেলাম নূতন-কিছু।

শেফালি

আর একবার বাতায়ন দিয়ে
বাতাস আসিল জোবে,
শিহরি উঠিল বালিকা শেফালি
শুইয়া মায়ের ক্রোড়ে ;
নুইয়া পড়িল নিরক্ত ঘাড়,
নীল অঙ্গুলি শীর্ণ অসাড়,
চোখের পাতায় সাঁঝের আঁধার
জমিল বেদনা-ভরে।

জীবন-পুষ্প পড়িল ঝরিয়া
বক্ষে লইনু টানি ;
থুইলাম এই করতলে সেই
ছোট হাত দুইখানি।
তখনো হাসিটি অধরে লাগিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছে জাগিয়া-জাগিয়া,—
শুভ্র কপালে শেফালি-পরাগ,
ঘুমায় স্নেহের রানী।

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালি
লুকায়েছে বালুকায়।
এক-একটি করে তারা জ্বলে-জলে,
চাঁদের রুপালি হাসি পড়ে ঢলে,
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে
অফুরান বেদনায়।

দেব-বালা এক আসে নিতি-নিতি,
ললাটে তারার টিপ,—
চরণ ছুঁইতে উছলে সলিল,
ডুবে যায় ওই দ্বীপ।
থামে থমকিয়া বন-মর্মর,
স্বচ্ছ-তরল-স্ফটিক-লহর,—
আঁচলে মুছিয়া অশ্রু উজোর
ধীরে নোয়াইয়া শির,
চুম্বন করে যায় সে হোথায়
ধূলি-কণা পৃথিবীর।

আষাঢ়ে

আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া
কেঁদে-রাঙা আঁখি ফুলায়েছে মোর প্রিয়া ;
আষাঢ়-আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে,—
জহুরি-চাঁপার সুরভি হাওয়ায় ভাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

কদম ফুটেছে, পেখম ধরেছে শিখী
শালুক-মেখলা পরেছে 'রানীর দিঘি'।
পুবে-বাতাসের সজল-উতল শ্বাসে
ব্যাকুল বকুল জমেছে সবুজ ঘাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে,
শরমে কেতকী ফুটে আঙরাখা-মাঝে ;
কাজলের কোলে আলোকের লেখা ভাসে,
ওগো, ধারা ঝর-ঝর এমন আষাঢ় মাসে,
আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত

অথ,

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়,
আষাঢ়স্যাই পয়লা,
ভরিল গগন নবীন-নীরদে,
বরন জিনিয়া কয়লা।

"শাপেনাস্তং-গমিত-মহিমা"
যক্ষ একলা বসিয়া
কাঁদছেন আহা, চক্ষু ফুলেছে
রুমাল ঘষিয়া-ঘষিয়া।
প্রিয়ার সঙ্গে কত ভাব, আড়ি,
ঝগড়া উঠিত পাকিয়া,
মনে হয় আর দেখেন আঁধার,
কহেন মেঘকে ডাকিয়া—
"ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
বিরহ-বার্তা বলো-বলো"—
বলিতে-বলিতে গিরি-কন্দর
ঘন কজ্জলে ছেয়ে প'ল।—
"প্রকোষ্ঠ হাতে কনক-বলয়
এই দেখ ভাই ভ্রষ্ট,
হয়রান ভাই কুবেরের শাপে,
মরণের বাড়া কষ্ট।
যক্ষগণের বাস্তু যেথায়
যাও সে অলকা-পুরীতে।
আজ পরবাসে সজল বাতাসে
তুমি যথার্থ সুহৃদ হে।
ফটিকের বাটি ভরিয়া সেখানে
তরুণীরা খায় 'বারুণী',—
নহে হুইস্কি, শেরি, শ্যাম্পেন,—
তা দিয়ে পেয়ালা ভরনি।
নাস্তানাবুদ করেছে রে ভাই,
ভালো তো লাগেনা জীবন,—
এখন কেবল দিবস গুনছি,
আষাঢ়ের পর শ্রাবণ।

পয়-পয় করে বলছি তোমারে,
ভুলো না কথাটা ভুলো না,
হ্যাদে ধর ভাই, এই লেফাফাটি,
হারিওনা আর খুলো না।
যেতে-যেতে পথে, দেখবে কোথাও
ফলেছে জম্বু থোলো-থোলো ;
ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
শুদ্ধ মুরতি বলো-বলো।
যাইতে যাইতে পল্লীর পথে
হয়তো পড়িবে চক্ষে
বঙ্গভূমির তন্বী শ্যামারা
চলেন কলসি-কক্ষে ;
কারো বা মাথায় ফিরিঙ্গি খোঁপা,
ঘোমটা আধেক খসা,
কারো বা কপালে 'কাচ-পোকা'-টিপ,
ভুরুর ভঙ্গি খাসা।
দেখবে কোথাও বালিকারা সব
পূজা করে হর-গৌরী,
সামনে দিঘিতে জল থই-থই,
ডুব দেয় পান-কৌড়ি।
কোনো মেয়েটির হাসি মুখখানি
ঘাটটি করেছে আলো,
পৃষ্ঠে এলানো একঢাল চুল
ভোমরার চেয়ে কালো।
দেখবে কোথাও অশথ-তলায়
জ্যাঠা ছেলেদের জটলা,
'হারু'র সঙ্গে তুমুল তর্কে
ব্যস্ত আছেন 'পটলা' ;
'টু' দিতেছেন অটল-চন্দ্র,
ভুলু হয়েছেন 'বুড়ী',
মহা-হই-চই, খেলা চলছে সে
লুকোচুরি-হুড়োমুড়ি।
'চারু' ভাবছেন মৌলিক আমোদ
এবার 'নষ্টচন্দ্রে',—
তিষ্ঠানো দায়, 'বার্ডসাই' এবং
সিগারেট-টার গন্ধে ;

এঁদের মধ্যে ওস্তাদ যিনি
বংশীতে দেন ফুঁ ;
ভাঁজছেন কেউ তোম-তানা-নানা,
কেউ ডাকছেন 'তু'।
রায়েদের বাড়ি চলছে বিচার
নৈশ এবং দৈন,
শিরীষটারে একঘরে কর.
গিরীশটা কি স্ত্রৈণ!
'বিদ্যাচুঞ্চু' করছেন বসে
'পঞ্চনলী'র ব্যাখ্যা,—
বেনারাস গিয়ে কেমন কবিয়ে
চড়েছেন তিনি এক্কা ,
বলছেন—'বাপু, দেখতে যদি সে
তিরিশ সালের বন্যে',—
নিশ্বাস ফেলে চক্ষু মোছেন
অতীত কালের জন্যে।
'প্রপঞ্চ এই বিশ্ব-দৃশ্য,
অনিত্য ইহ চরাচর,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-যৌবন
চলিয়া আসছে বরাবর।
পিঁপড়ের মতো মানুষের সার
যাচ্ছে ফিরিয়া আসছে,
প্রবীণেরা পড়ে 'মোহমুদ্‌গর'—
নবীনেরা ভালোবাসছে।'—
যাক বাজে কথা, যাও পুষ্কর
অলকার সেই কক্ষে,
রুখুভুখু চুলে কাঁদিছে রূপসী,
বীণাটি ভিজিছে বক্ষে।
যাও, মেঘ, ভাই, যাও তুরন্ত,
অধিক কি আর বলব?
জল-ভরা চোখ রুমালে চাপিয়া
কতকাল বলো জ্বলব?
বড় সুখে ভাই ছিনু অলকায়,
সে এক স্বপ্ন-রাজ্য,
রোজ-রোজ ভাই ভোজের ফর্দ
চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য,

জাফরান-রাঙা মটন-কোর্মা,
চপ-কাটলেট-পোলাও,
তস্য উপরি ল্যাঙড়া আম্র
এবং রাবড়ি ঢালাও।
মিটাতাম তৃষা চাখিয়া-চাখিয়া
আনারকা মিঠা শরবত,
গড়গড়া থেকে উড়িয়ে দিতাম
ধোঁয়ার 'বিন্ধ্য' পর্বত।
ছয়লাপ আজ ময়দান ভাই
'ইলশে-গুঁড়ুনি' ঝরছে,—
দেবতাগুলির মধ্যে দেখছি
বরুণ-বাবুই 'খরচে'।"
চললেন মেঘ, কম্ফর্টারটি
কণ্ঠে জড়ান যক্ষ,
পাছে হয়ে পড়ে 'ব্রঙ্কাইটিস',
হাঁসফাঁস করে বক্ষ।
একে এসেছেন বিদেশ-বিভুঁই,
তাতে কাছে নেই পরিবার,
রোগ হলে 'ম্যাও' ধরিবার
(এবং) এক-আই পাখা করিবার।

মনোহারিকা

বনফুলের বরণ-মালা
পাতার কোলে দুলিয়ে রে,
বল রে তৃণ, বল আমারে
কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে?
ওই নারিকেল-গাছের ঘন
কুঞ্জবনের আবছায়ে,
বল কোথা তার কুন্দমালা
পথের ধুলায় লুটিয়েছে?

একলাটি সে থাকত শুয়ে
সাঁঝের আলোর ঝলমলে

ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু
দূর্বাদলের মখমলে—
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু-
উজল ভুজ-বল্লরী,
কাঁটাহারা-তরুণ-গোলাপ-
শাখার মতন ঢলমলে।

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
'রাস-দেউলে' দাঁড়িয়ে সে
কল্কা-পেড়ে শাড়ির কোনা
তর্জনীতে জড়িয়েছে :
এক-মনে সে শুনতেছিল
কানুর গানের অন্তরা,
ব্রজ-বধূর দীর্ঘ-শ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে ।

সে যে আমার গানেব মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী ,
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে,—
আর কতদিন পথের পানে
চাইব দিবা-শর্বরী!

হারা

চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন গাছের পাতার ফাঁকে,
ফাগুন মাসের উতল বাতাস আথিবিথি খোঁজে তাকে—
মুক্ত চিকুরভারে, কুঞ্চিত জলধারে
অঞ্চল তার ঝাঁপায়ে পড়েছে নীল তটিনীর বাঁকে।

আজীবন তারে সেবিয়া আসিনু ভুলিয়া সকল কাজ,
বাঁশরির সুরে মজিয়া রহিনু, ধরিনু পাগল-সাজ,—
শুভ্র ফাগুন রাতি মলয় উঠিল মাতি
দুয়ারে আমার মাধবী-মুকুল ঢাকিল সকল লাজ।

জীবন লইয়া কি খেলা খেলিনু, কি ভাবিল সখী মোর,
অলক-বিজুলি ধূলায় ঢাকিয়া ভরিল সে মোর ক্রোড়—
শান্ত-গভীর আঁখি করুণ-কান্তি মাখি
কহিত মোরে নীরব ভাষায় জড়ায়ে পুষ্প-ডোর!

বৈশাখী-চাঁপা নগ্ন অঙ্গ ফুটিত ফুলের সনে,
আকাশের পানে চাহিত কিশোরী, ভাবিত কি আনমনে ;
দেখিতাম চেয়ে-চেয়ে কোলে তার সোনা মেয়ে-
সুদূর হইতে বংশী বাজিত সন্ধ্যাব সমীরণে।

সুখের কুঞ্জ ভাঙিয়া গিয়াছে, শূন্য সাজানো ঘর,
চুরি গেছে মোর বুকের মানিক জ্যোৎস্না-ডোবার পর,—
কি ভুলে ভুলিব আর, তরুমূলে বার-বার
শুনি এসে তার মঞ্জু সেতার, মঞ্জীর মন্থর!

বন্দনা

তব আরতির পূজা-উপচার সাজায়ে আজি
অঞ্জলি ভরি এনেছি, জননী, কুসুমরাজি ;
জ্যোৎস্না-রেণুর ঝিকিমিকি রচি আঁচল-ভাঁজে,
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস-সরসী-মাঝে।

এস মা কবিতা-মুকুতা-মালিকা কণ্ঠে পরি,
নন্দনবন-তরুমর্মরে শ্রবণ ভরি—
শুভ্র-অভয় স্নেহ-কর-শাখা-পরশ লাগি
স্পন্দিত প্রাণে আছি, মা, দীর্ঘ প্রহর জাগি।

তোমারি বিশ্ব-বিনোদ-বীণার দিব্য তানে
তন্ময় হয়ে রহিব, সারদে, তোমারি ধ্যানে ;
স্বচ্ছ-বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা দাও, মা, দাসে,
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মানিক ললিত ভাষে।

কল্পে-কল্পে তব করুণার কণিকা লভি
ধন্য হয়েছে কত অভাজন ভক্ত কবি ;
বিচিত্র বাণী করেছে রচনা অমৃতে ভরি
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট গিয়াছে পরি।

কত অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ ছন্দে গাঁথি
এনেছে ধরায় বৈজয়ন্ত অরুণ-ভাতি ;
সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত সাগর হতে
উঠে, মা, তোমার বোধন-মন্ত্র শ্লোকের স্রোতে।

মনে পড়ে তীর 'সরস্বতী'র ছায়ায় ঢাকা ;
রক্ত-ফলের বর্তুলে ভরা বটের শাখা,
নৈমিষ-বন, হোম-হুতাশন, সুরভি-হবি,
বাকল-বসনে ধ্যানের আসনে তাপস-কবি।

এস, মা, তুষার-কুন্দ-ভূষণা, হে বীণাপাণি,
প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু দাও, মা, বাণী!
মার্জনা কর অপরাধ মম এ আরাধনে,
এস গো জননী, এস সেবকের হৃদয়াসনে।

সমর্পণ

ওরে মান কুড়াইয়া কি হবে?
যা আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে
দান কর তুই নীরবে ;
আর, মান কুড়াইয়া কি হবে?
দে রে দে রে লাজ ভাসায়ে,
সাজ আজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।
খুলে ফেল ফুল-আঙিয়া
বালুকার ঘরে লুকোচুরি খেলা
সন্ধ্যায় যাক ভাঙিয়া।
জীবনে বরিষ অমিয়া,
সকলের কাছে মহিমার মাঝে
ফলভরে থাকো নমিয়া।
সমস্ত যাও সহিয়া
শত অবজ্ঞা শত বিদ্রূপ
যাও নতশিরে বহিয়া।
মিছে, মান কুড়াইয়া কি হবে?
যা আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে
দান কর ভাই নীরবে ;
আর, মান কুড়াইয়া কি হবে।

শান্তিজল
১৯১৩

চিরসুন্দর

কুসুম-হারে সুতার-সম
লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপড়ি যখন পড়বে ঝরে
হেরব তোমায়, বিশ্বপ্রাণ।
ধুলামাটির এই পৃথিবী
দিয়েছ নাথ পা'র তলে,
সেইখানে সে থাকবে পড়ে
বাঁধা করম-শৃঙ্খলে ;
ছাড়িয়ে যাব মানিক সোনা,
লক্ষ হীরার অলঙ্কার ;
বৈতরণী পেরিয়ে যাব
তোমার নায়ে কর্ণধার।

কাল কি হবে? দুর্ভাবনায়
গলবেনা আর নেত্রজল,
দুঃস্বপনে চমকে উঠে,
কাঁপবেনা এই বক্ষতল।
হাসে যেমন সরল বালক,
হাসে ভুবন ভুলিয়ে রে ;
নির্মলতা উথলে ওঠে
আনন্দ-দোল দুলিয়ে রে!
তেমনি করে বইবে আমার
হর্ষ-পীযূষ-প্রস্রবণ,—
শান্তি শুধু প্রসাদ-মধু,
প্রেম-সাগরে সন্তরণ।

দিগ্‌বলয়ে রক্ত-রবি
পূর্ণ ব্রহ্ম-মূর্তি যাঁর,

অন্ধকারে তারার হারে
ব্যাপ্ত-বিরাট-নির্বিকার,
দীপ্ত তাঁহার নয়ন-মণি—
কে গনে তার সংখ্যা নাই!
রাত্রি-দিবা যুক্ত-করে
করুণা তাঁর চাই গো চাই।

কত সুযোগ, দীক্ষাগুরু
হারিয়ে হেলায় অন্ধ মন,
প্রত্যহ তুই করিস শুরু
নবীন নেশার অন্বেষণ!
সুখ-পিপাসায় শুষ্ক তালু,
সুখ না মিলে, সুখ সে কই?
হাত বাড়িয়ে পাসনে কিছুই
বুক-ভাঙা এই দুঃখ বই।
কবে কোথায় সাগর-কূলে
পেয়েছিলাম তার নাগাল,
আচম্বিতে মিলিয়ে গেল,
চোখ মুছিনু দীন-কাঙাল।

নেহারিলাম কি হাসি তার,
কি সারল্য মুখ 'পরে!
পদ্মফুলের মতন বিমল
সুখ লভিনু বুক ভরে—
সামনে আমার মুক্ত হল
দূর দেউলের পুণ্য-দ্বার,
হেরিনু মোর প্রাণেশ্বরের
অতল অ-তীর প্রেম-পাথার।

বন-গিরিতে ঢের ঘুরেছি,
মন ভরেনাই কিন্তু নাথ,
ঊর্ধ্বে চেয়ে উদাস বুকে
উধাও ছুটি দিবস-রাত,—
জ্যোৎস্না-মেঘে মগ্ন পাখায়
লগ্নফেনমঞ্জরি—

যাত্রী আমার পরান-পাখি
নীল পারাবার সন্তরি।
এই সুষমার সীমার শেষে
ঘর বাঁধিতে উন্মনা—
ত্বর সহেনা,— কোন ঠিকানা?
ফুরিয়ে গেল দিন গোনা।
সকল স্মৃতি দাও ঘুচায়ে,
থাকুক শুধু এক স্মৃতি,
জীবন থেকে দাও গো মুছে
ভক্তিহীনের দুষ্কৃতি।

আজও তুমি যাওনি ছেড়ে
আকাশ যে তার সাক্ষ্য দেয়,
ফুটিয়ে তোল গোলাপ-কলি
ফুল্ল-ললিত লাল শোভায়।
মধুমাসের হিন্দোলাতে
মন্দ-মৃদুল-দোল ভরে,
ফোটা ফুলের পরাগ-ধূমে
কানন-বধূর অন্তরে,
অরুণ আলোর ফুল-ঝুরিতে,
চিরতরুণ আলপনায়
বন্দে তোমার স্বভাব-কবি
ভূমানন্দ-কল্পনায়
বৃষ্টিধারায় তোমার বাণী
শোনে সেবক তন্মনে,
আছ অ-তাপ অনলসম
কঠিন-শীতল ইন্ধনে—
মুহূর্তেরি প্রমাদ-বশে
যদিই তোমায় বিস্মরি,
ঘুচিয়ে দিয়ো, বিনাশিয়ো
অবিশ্বাসের শর্বরী।

ভাবি-দিনের মোহন মুখের
ঘোমটা ছিঁড়ে দেখরে মন,
জলে-স্থলে সূক্ষ্ম-স্থূলে
শাশ্বত তাঁর সিংহাসন।

চিন্তা দিয়ে পথ বাহিয়ে
ছুটিস মিছা, হয়না লাভ!
সামনে উজ্জ্বল অনিত্য জাল
বুনছে মায়ার উর্ণনাভ।
যৌবনে নেই বিন্দু প্রমোদ,
কদিন রূপে মন ভোলে?
সামনে নাচে ছিন্ন-মস্তা
কাম-রতিকে পায় দলে।
প্রহেলিকার গোলক-ধাঁধায়
ক্রোশের পরে ক্রোশ চলি,
রহস্যময় পরশ-মণি
ভরবে কখন অঞ্জলি!

জ্বলবে আলো চিত্ত-গুহায়
কারণ শরীর অন্তরাল,
সুষুপ্তিতে বিলীন হবে
মর্ত্য-আঁখির চক্রবাল!
ঘোর বিপদের ছদ্মবেশে
মঙ্গল আসে, ভয় কি তোর?
সাধন-পথের বিভীষিকায়
শঙ্কা কিসের আত্মা মোর?
বল দেখি আজ সকাল থেকে,
হায় রে ক্ষ্যাপা চপল মন,
কি করেছিস্? কি জপেছিস্?
হয়নি তো তাঁর নাম-স্মরণ।
সবার সেরা বন্ধু যিনি,
ওরে কৃপণ, যাঁর দানে
পূর্ণ করিস মঞ্জুষা তোর,
চাইলিনা তো তাঁর পানে।
ডাকলিনে সেই নির্বিশেষে,
ইহার অধিক ভ্রান্তি নাই—
কোহিনুরের কান্তি হেরে
করলি জমা কয়লা-ছাই।

মৃত্যুশোকের শক্তিশেলে,
গরলে প্রাণ জর্জ্জরে—

তুমি যারে বরণ কর,
এই তুফানে সেই তরে।
অরণি হায় দগ্ধ হয়েই
জ্বালায় হোমের বৈশ্বানর,
তুমি যাকে প্রসন্ন হও
লুপ্ত গো তার আত্মপর।
আকুল সরিৎ সমুদ্রে ধায়
করতে জীবন বিসর্জন,
পথের মাঝেই উজান জোয়ার
দেয় তারে প্রেম-আলিঙ্গন ;
কোন মোহানায় তেমনি আমায়
আগ বাড়ায়ে লইবে নাথ?
কোন লগনে করবে পরশ
এই বিরহীর রিক্ত হাত?
ফুরিয়ে যাবে মরু-নিদাঘ,
ভুবন হবে বৃন্দাবন,
সকল সলিল তীর্থ-সলিল,
জীবের আনন চন্দ্রানন।
জাগবে চোখে শ্রীমুখ তোমার,
হৃদয় হবে হরিদ্বার,
ভুলব তোমার মোহন-মোহে,
জানব তোমায় সারাৎসার।

গহন বনে পথ হারায়ে
প্রাণের দায়ে পান্থজন,
ডাকে যেমন, তেমনি হরি
ডাকতে শিখাও, নিরঞ্জন।
কুসুম-হারে সুতার-সম
লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপড়ি কবে পড়বে খসে?
চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ।

কাঞ্চন-জঙ্ঘা

নীল আকাশে বুলিয়ে তুলি
তুষার-সাদা শেখরগুলি
কে আঁকিল মেঘ-সাগরের পারে?

বালক-ভানুর আলোর কণা,
রঙ-ফলানো কি আলপনা
দিগ্‌-বধূরে সাজায় মোতির হারে।

শ্বেত বিজুলি নিথর হয়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্তি লয়ে—
শিথানে তার উজল ঢেউয়ের সারি .

ছাড়িয়া ওই উষার তারা
সামনে নেমে আসছে কারা?
কটাক্ষেতে স্ফটিক হল বাবি।

অভ্রভেদী দুর্গ-প্রাকার,
অলঙ্ঘ্য ওই দূর পরিখার
এমন মহান মোহন ছবির পানে

নির্নিমেষে রইনু চেয়ে—
মৌনী পরান যায় গো ছেয়ে,
সংজ্ঞা হারাই কোন অনাদির ধ্যানে।

মহাকালের পারাবারে
কে তাহারে খুঁজতে পারে?
ডুবতে পারে ধ্রুবের সমাধিতে?

অচিন বেলার ঊর্মি তালে
কোন স্বপনের অংশু-জালে
ধরতে পারে—রেখায়-শ্লোকে-গীতে?

তন্দ্রাপথে উঠতে পারে
অস্ত-উদয়-শেষ-কিনারে
শেষ ধ্বনিটির প্রতিধ্বনির সনে?

টুটবে আশার নীহারিকা
ফুটবে অশোক-মেরুর শিখা,
নিত্য-নবীন মিলবে চিরন্তনে।

হারানো সেই আনন্দ-ধন
কোন তোরণে করবে বরণ
তন্ময়তায় লুটিয়ে হৃদয়-তনু

অনন্ত সে শান্ত হয়ে
স্বরূপ-রসে উচ্ছ্বসিয়ে
ফুটিয়ে দেবে ত্রিদিব-ইন্দ্রধনু।

কোন অমৃত-চন্দ্রিকাতে
তুহিনা-ঝরা যূথীর সাথে
কইব কথা সুপ্ত-ফুলের শেজে,

প্রহর-সনে প্রহর গাঁথি
প্রেম-আরতির অগাধ রাতি।
উদ্বোধনের সপ্তক উঠে বেজে।

মর্ত্য-মানস-সমুদ্র-নীর
উন্মথিবে অ-তল অ-তীর
জাগবে মন্দ্র জীবন-শঙ্খ ভরি!

সুখের সুধা, বিষাদ-গরল—
পূর্ণ তরল, কল্প-অনল
উদ্ভাসিবে অন্ধকারের দরী।

হেরব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট শিখী কলাপ ধরে,
তারায়-তারায় বরণ-শোভা জাগে।

প্রেম-গোমুখীর মন্দাকিনী,
চন্দক-উদক-কল্লোলিনী,
অযুচ ধারায় ঝরবে রসে-রাগে।

দিব্য-দেউল-দীপালিতে
জপারতির মন্ত্র-গীতে
মগ্ন হব কারণ-মধু-নীরে।

সুদূর মণি-কর্ণিকাতে,
পরসাদের পূর্ণিমাতে,
উত্তরিব অরুণিমার তীরে।

লোকান্তরের অবন্তীতে,
অশ্রু-উজল অঞ্জলিতে,
করব কবে সর্ব-সমর্পণ?

মৃত্যু যেথায় পায় গো বিনাশ
অন্ত-আদির পরম বিকাশ—
পূজব শান্ত সত্য-নিরঞ্জন।

অতীত

নাই সে সবল কিশোর বয়স,
সাঙ্গ সুখের খেলা,
আম্র বনে সখার সনে
প্রাণের কথা বলা,—
পথের বাঁকে গাছের ফাঁকে
শালিক-শ্যামা-দোয়েল ডাকে,
শালুক-ফোটা বিলের বুকে
ভাসে কলার ভেলা।

মিলত কত খেলার সাথী
সাঁঝের বেলাটিতে,
আসছে ভাসি তাদের হাসি
স্মৃতির তটিনীতে,—
বাঁশির সুরে মাঠের মাঝে
কোথায় গৌড়-সারঙ্গ বাজে?
অনুরাগের উৎস জাগে
সুরের লহরীতে।

উড়িয়ে 'ময়ুর-পঙ্খী' ঘুড়ি
চিলের ছাতে উঠে,
জয়োল্লাসে অট্টহাসি
দেশের ছেলে জুটে—

কোথায় রে সেই খেলার সাথী?
ঝাউ-বাগানে চড়ুই-ভাতি—
নির্ভাবনার মূর্তিগুলি
ফুলের মতো ফুটে।

একত্তরে যাদের সাথে
ফলসা-বনে ঢুকে
অম্ল-মধু ফলের লোভে
জল সরিত মুখে,
গাছের তলে গ্রামের মেয়ে
আঁচল মেলে দেখত চেয়ে
লোহিত-কালো ফলের থোলো,
ডালের ভরা বুকে।

'বুড়ো শিবে'র মন্দিরে সেই
বটের ঝুরি ধরি
মনের সাধে দুলত এসে
'হাবুল', 'ভোলা', 'হরি'—
রথের দিনে মিতের সনে
সুখের তুফান জাগত মনে,
চোখে-চোখে চলত কথা
নাগর-দোলা চড়ি।

স্থল-কমলে করত আলো
'দত্ত-দিঘি'র তীর,
'চালচিত্তির' করত 'পোটো'
সিংহ-বাহিনীর—
আগমনীর ললিত স্বরে
ঘরের ছেলে ফিরত ঘরে,
বছর পরে কোলাকুলি
ভাসান-রজনীর।

ভোরের ভজন- খঞ্জনি-তান
মঙ্গল-আরতির,
মন্ত্রগীতে কি মূর্চ্ছনা
বিভাষ রাগিণীর!—
অবগাহন-পুণ্য-স্নানে

চলত কারা ঘাটের পানে,
পূজার ফুলে সাজিয়ে দিত
সুরধুনীর নীর।

'ভাই-দ্বিতীয়া'র দীপ্ত টিপের
চন্দন-সৌরভে
মিশত 'চুয়া'র গন্ধটুকু
কুয়াশা-হীন নভে,
দেয় ভগিনী ভাইকে ফোঁটা,
যমের দোরে পড়ল কাঁটা,
ঘরে-ঘরে ভক্তি-স্নেহ
হর্ষ-মহোৎসবে।

পৌর্ণমাসী 'রাস'-যামিনীর
রঙ্গ-বাসর ভরি
হেম বরণী রাই কিশোরীর
মান ভাঙিতেন হরি,—
ঝুমকা জবার মঞ্জরিতে,
তরুলতার রঙিন শ্রীতে
হেমন্তেরি জ্যোৎস্না-ঝারি
পড়ত ঝরি-ঝরি।

আমের বোলে যবের শিষে
শ্রীপঞ্চমী-তিথি,
মহাশ্বেতার চরণ-মূলে
আরাধনার গীতি,
মধু-মুকুল-তরুণ পরান
করত প্রণাম অঞ্জলি দান,
ধ্যানের চোখে দেখত মায়ের
চির-অভয় স্মিতি।

নাম ধরে সেই ডাকত যারা
নিত্য সকাল-সাঁঝ?
যায় না যাদের চিনতে পারা
দেখতে পেলেও আজ ;
নেই সেদিনের চিহ্নটিও
পর হয়েছে পরান-প্রিয়

উদাস চোখে থমকে তাকায়
হয়তো পথের মাঝ।

কেউবা সুধায়— 'কেমন আছে'?
চেনা-গলার স্বর,
ভিন্ন কুলে জনম,—তবু
ছিলাম সহোদর,
কাছে এসে আদর-ভরে
শিশুর মতো জড়িয়ে ধরে,—
কে জানে কোন দূরান্তরে
বেঁধেছে তার ঘর।

যৌবনেতেই চুল পেকেছে,
গাল-ভরা সেই হাসি
এই দুনিয়ার মন্থনে হায়
কোথায় গেছে ভাসি!
দাঁড়িয়ে কথা ক'বার মতো
আছে কি আর সময় ততো?
কে কারে চায়? পান্থশালায়
রাত্রি-পরবাসী!

কুমার-হারা ভবন-সম
বিষণ্ণ এই হৃদে
আজকে কাদের অদর্শনে
কাঁটার মতন বিঁধে!—
প্রদোষ এসে তিমির-নিকষ
ছায়ায় ঢাকে আয়ুর দিবস,—
কখন উষা সোনার কসি
টানবে অবিচ্ছেদে!

আজকে কেবল আসছে মনে
সেইদিনকার কথা,
চিত্তে যখন জাগতনা রে
মিথ্যা-কুটিলতা ;
ফিরবে কি সেই সুখের দিবা?
ফুটবে হাসির তরুণ-বিভা?
তপোবনের বালক-সম
শান্ত প্রসন্নতা।

ওয়াল্টেয়ার

মিনি সুতায় কে গেঁথেছে
উজ্জ্বল মণিমালা?
সাজিয়েছে কোন উপাসিকা
পূজারতির ডালা?
সীমাচলের চরণ-মূলে,
অপরূপ এই পাষাণ-কূলে
কে তাপসী আননে তার
ধ্যানের জ্যোতি ঢালা?

সামনে হেরি সুনীল বারি
তালী-বনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙা ভাঙা মাটি
ঢালু পথের বাঁকে,
ঝরনা-ঝালর পড়ছে ঝরি
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে।

এই গরিমার তোরণ-তলে
মন-হারানো মনে,
ঝিল্লিরবের সুর-বাহারে
বন-বালাদের সনে,
শৈবালে আর ফুল-বলয়ে
পথ ভুলে এই স্বপ্নালয়ে
জলধরের বিলোল-খেলা
আধেক জাগরণে।

নীল লহরির মাথায় অথির
ফেনার যূথীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে
দেখরে হেথায় আসি
বুলিয়ে তুলি গিরির গায়ে
ঘোর বেগুনি রঙ ফলায়ে
সাগর-ধোয়া রবির করে
ঝরছে তরল হাসি!

পুরানো কোন গানের কলি
ঢেউয়ের কলস্বরে
জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়ে
ধূসর শিলার 'পরে-
দূর-প্রসারি লবণ-বারি,
ভাসছে সাগর-মরাল-সারি,
গাহন করে পাষাণ-করী
শীকর-ঝারি ঝরে।

এই কূলে ওই নীল অচলের
গভীরতম খাদে,
নিক্ষেপিল নিঠুর জনক
বালক সে প্রহ্লাদে,
পড়ল শিশু পুষ্প 'পরি,
আপনি এসে দয়াল হরি
নিলেন কোলে কল্পতরু
নামের পরসাদে।

এখনো এই মধুর ভূমে
সুদূর বিধুরতা
গোপন আছে সাগর-সুরে
করুণ সে বারতা।
উলঙ্গ ওই তামিল-বালক
কুড়ায় রঙিন পাখির পালক,
চাপিনু তায় বুকের মাঝে—
কইনু নীরব কথা।

কবে গো রাম রঘুমণি
হারিয়ে জানকীরে
আলা-ভোলা এলেন হেথায়
রত্নাকরের তীরে?
যেদিক পানে ফিরান নয়ন
ভূধর, সলিল, আকাশকানন,
বিরস-মলিন সব সুষমা,
অমা-তিমির ঘিরে।

সামনে একি বিরাট বাধা!
জলের অজগর
হাজার ফণায় উচ্ছুসিয়া
ফুঁসছে নিরন্তর,
মহান প্রেমের চরণ-তলে
নুইয়ে গ্রীবা পড়ল ঢলে
মাথায় নিল পাষাণ-সেতু
বাঁধল সুদুস্তর!

এজন্মে আর হয় তো কভু
হবেনা মোর আসা,
থুয়ে গেলাম পাথর ফুঁড়ে
আমার ভালোবাসা,
তরু-বাকল-পরগাছায়
বাসনা মোর ঘুরবে হেথায়,
উষার শরম-অরুণিমায়
মিটবে প্রাণের আশা।

হে জাদুকর শৈল-নগর!
বঙ্গসাগর-বেলা,
আঁধার রাতে বাতি-ঘরের
চপল আলোর খেলা,
কালীর বর্ণ অন্তরীপে,
জ্বালিয়ে স্বর্ণ-আকাশ-দীপে,
পরশ-মণির রশ্মিপথে
ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

তন্দ্রাপথে

মেঘের পুরীর পর্দা তুলে
নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে,
কোন তারকার ইঙ্গিতে আজ,
পৌঁছিব গো কোন দেশে?
হাওয়ায়-বাজা বীণার তানে
মন ছোটে আজ কোন উজানে?

শূন্য গুহায় নূপুর শুনি
কোন পুলিনে যাই ভেসে?

উড়ো পাখির সুরের সুধায়,
সরল-তরুর আবছায়ে,
প্রবাল-বরন বৈকালে আজ
কোন পাষাণী গান গাহে?
ফুল-পরাগের ঘোমটা টানি
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী
আলতা পরায় তার পায়ে।

রূপের তরী ভাসায় পরী
গৌরী চাঁপার রঙ মেখে,
পদ্ম-গোলাপ নিন্দি পাখা
পরিয়েছে তার অঙ্গে কে!
কোন মহুয়া-মদির সুরা
পান করে ওই ফুল-বধূরা!
পালিয়ে গেছে প্রাণ-বঁধুয়া
বিম্বাধরে দাগ রেখে!

বিস্মৃত কোন তূর্য-ধ্বনি
গর্জে বুকের পঞ্জরে?
পথ হারায়ে ঝঞ্ঝা ফিরে
রুদ্র-গহন সুন্দরে,—
ছিন্ন কেতু ঊর্ধ্বে ধরি
উঠছি একা শৈল'পরি—
নীল অশনি ঝলসে গেছে
দ্রাক্ষা-বনের অন্তরে!

লো সুষমা, এসেছি আজ,
ছিঁড়িয়া ডোর-শৃঙ্খলে—
ডাকছে আমায় অস্ত-তারা
প্রাণ যে আজি চঞ্চলে!
কোন পথে আজ অচল চলে?—
শান্তিজলের ঝরনাতলে

ফুটবে কবে মানস-মৃণাল
ফুল্ল সোনার উৎপলে?

পথকে আজি ঘর ভাবিনে—
ঘর যে আমার ঢের দূরে।
কোথায় বাজে বসন্ত রাগ?
মন মজেছে সেই সুরে।
পৌঁছিব গো কোথায় গিয়া?
উথলে উঠে নগ্ন-হিয়া—
আঁকব শোণিত-বিন্দু দিয়ে
শেষ গোধূলির সিন্দুরে!

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা
বৈজয়ন্ত-নন্দনে?
স্বপ্ন-চাতক পক্ষ মেলে
মন্ত্রমাখা রঞ্জনে—
মানব-জীবন ঢেউয়ের মতো
কোন বেলাতে মর্মাহত?
নয়ন মুদি ঝরনা-ধূমে
কোমল ঘুমের অঞ্জনে।

কোথায় রে শেষ পান্থশালা
কোন রুপালির প্রাঙ্গণে?
শঙ্কারে আজ নির্বাসিনু
এই বেলা এই নির্জনে—
মুক্তাহারা শুক্তি তুলে
কোন খেলাতে ছিলাম ভুলে?—
নে গেঁথে মন বরণ-মালা
অনুরাগের রঙ্গনে।

রাত্রি-রানীর আশার বাণী
দিনের হৃদয় দেয় ভরে—
অনন্ত কাল মৌনী রহে
প্রশ্নহারা উত্তরে।
চন্দ্রাতপে ঘুমায় কারা?
হাজার ডাকেও দেয়না সাড়া,

নীল আকাশের প্রসার মাপে
রশ্মি-মুকুট ভাঙবে।

ডুব দিনু আজ ধ্যান-সাগরে,
সব বাসনার সুপ্তিতে,
জানব তাঁরে মৃত্যু-ভূমি
পারেনি যাঁর রূপ দিতে।
শুকিয়ে গেছে সোনার মাটি,
কোন ফসলে বাঁধব আঁটি?
তন্দ্রাপথের অন্ত কোথায়
নিত্য দিনের দীপ্তিতে?

পথে

কে আজি মোর দোসর হবে
পথ-হারানোর দেশে?
রিক্ত করে সঙ্গ নেবে
রৌদ্র-ছায়ার শেষে,
আমার আঁখির বাষ্প-মেঘে
পুষ্প-শোভা উঠবে জেগে,
তরল-তর রত্ন নীহার
গাঁথবে অনিমেষে।

কে হবে মোর মর্ম-দোসর,
মুক্ত বাসর-সাথী?
এই ভিখারির ছিন্ন মালা
কে নেবে কর পাতি!
চাহিবেনা সে ফাগুন-মাসে
ফুলের হিসাব তরুর পাশে,
কোন তারিখে ফুটল মুকুল
পরাগ-রসে মাতি।

সব পাহারা পেরিয়ে চলি
যৌবনের এই সাঁঝে,

শুক-তারকা ফুটায় আঁখি
অন্তরেরি মাঝে,—
ভুবনে মোর নাই ভাবনা,
পবন-পথে কি মূর্ছনা!
সকল পাখির কণ্ঠ-সারং
পঞ্চমেতে বাজে!

বন্দি আজি মন-রসনা
বন্য মধুর চাকে।
মন্ত্র লব কুঞ্জবনের
খঞ্জনেরি ডাকে ;
উড়তে চাহে চিত্ত-সারস
পঙ্কভারে পক্ষ অলস,
কোন অজানায় জপ-সাধনায়
খুঁজব দেবতাকে?
কে আজি মোর দোসর হবে
পথ-হারানোর দেশে?
রিক্ত করে সঙ্গ নেবে
রৌদ্র-ছায়ার শেষে!

শান্তি

মনের মাঝে নূপুর বাজে
জীবন-মরণ গুঞ্জরি
ঝরে গো যাঁর চরণ-তলে
প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরি,
কবিতা যাঁর মন্ত্র জপে
দিন-যামিনীর ছন্দে গো,
ধরণী যাঁর জ্যোতির সরোজ
ধেয়ায় মহানন্দে গো।
শারদ নভঃ প্রসারি ওই
সাগর-বরন উত্তরী,
শুভ্র মেঘের কম্বু-রবে
বিশ্ব-দেউল দেয় ভরি!

নর-নারীর প্রাণ-অরণি
জ্বালায় গো যাঁর যজ্ঞানল,
সেই অরূপের চরণতলে
লুটিয়ে দিলাম ললাট-তল।

রাজার রাজা, স্বামীর স্বামী,
ব্রজের বিনোদ-চন্দ্র হে,
বাজাও মম জীবন-রেণু
জাগাও মধুর মন্দ্র হে!
ডাকত তোমার মধুর নামে
সারিকা-শুক-চন্দনা,
কি মন্ত্রে আজ কোন বাণীতে
করব তোমায় বন্দনা!
মিশিয়ে সমর-তূরীর ধ্বনি
সিন্ধু-সলিল-কল্লোলে,
করলে আঘাত রক্ষোনাথের
স্বর্ণপুরীর অর্গলে!

বুদ্ধরূপে বলির যূপে
কণ্ঠ-সমর্পণ-তরে,
আকুল হলে জীবের দুখে,
অশ্রু ঝরে অন্তরে!
সফল-তপা মহান প্রেমের
সুধর্ম-রথ-নির্মাণে,
লুটিয়ে দিয়ে সুখের মুকুট
তৃপ্ত পরি-নির্বাণে!

পূর্ণ তুমি, অংশ তুমি,
আকার-বিহীন, সাকার হে।
খর্ব কর দর্প-মোহ,
সর্ব মনোবিকার হে।—
কোন পটে আজ রঙ ফলাবে
চিত্ত-চিত্রকর মম?
দাও হে বঁধু, বর্ণ-মধু,
বিরাট-পুরুষ, সত্তম।

বাঁধের গায়ে ঘর বেঁধেছি,
কখন ভাঙে তাই ভাবি,—
গচ্ছিত এই রত্ন-ধনে
এক নিমেষের নাই দাবি।
কোথায় রবির অস্ত নাহি,
মর্ত্য রবে পশ্চাতে—
এই বালুকায়, তপ্ত বেলায়,
ছুটবনা হায় তৃষ্ণাতে।
টলবনাকো ঝঞ্ঝা-ঝড়ে,
দুঃখ-শোকের খর্পরে,
ভুলব ললাট তোমার বলে
সকল বাধা জয় করে!

ধর্ম তুমি, শর্ম তুমি,
নিখিল তব নর্ম নাথ,
আজ তোমারে ডাকছি প্রভু,
আজ কি আমার সুপ্রভাত!
মন্থেনা আর অন্ত ঃ-সাগর
হিংসা-দ্বেষের মন্দরে,
উথলে ওঠে শান্তি-সুধা
গভীর গোপন-কন্দরে।
মনের মাঝে নূপুর বাজে,
জীবন-মরণ গুঞ্জরি
ঝরে তোমার চরণতলে
প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরি।
নরনারীর প্রাণ-অরণি
জ্বালায় তোমার যজ্ঞানল,
আজকে তোমার চরণতলে
লুটিয়ে দিলাম ললাটতল।

নব-বর্ষ

নব বরষের নবীন বাসবে মিলনের শতদল
ফুটিয়া উঠিল বাণীর পূজায় বিতরিতে পরিমল।
উথলিয়া পড়ে আকাশে-বাতাসে রঙের-রসের ঝারি ;
নব-প্রভাতের নবারুণ রাগে রঙিন সাগর-বারি।
গেছে পুরাতন অস্ত-অচলে মেঘ-যবনিকা টানি—
নবীন এনেছে চির-সুন্দর নন্দন-ফুলদানি।
পরাগ দিয়ে কে লিখিয়াছে লিপি পারিজাত-পাপড়িতে-
রঞ্জিত আজি কুঞ্জ-তোরণ আরতির দীপালিতে।
দিন-যামিনীর হিন্দোলা দোলে মরু-গিরি-পারাবারে—
তার মাঝে তুমি হে নব-বর্ষ, খেলিতেছ ফুলহারে।
কল্পে-কল্পে কত বসন্ত, নব-যৌবন বহি
কত অশান্তি, কত পরাজয়, মৃত্যু, বিরহ সহি—
বিশ্বাস-মেরু-তারকার পানে চেয়ে-চেয়ে কত রাতি,
কত উত্থানে, কত না পতনে গঠিল মানব-জাতি,
তুমি তা দেখিছ হে প্রিয় নূতন জাগিয়া সগৌরবে
কত ভাস্কর ডুবিয়া গিয়াছে মহাকাল-অর্ণবে।

ভুবনে-ভুবনে ছুটিয়া চলেছে মঙ্গল-রথ যাঁর,
হে বর্ষ তুমি সে রথেরই চাকা ঘুরিতেছ অনিবার ;
ষড়ঋতু ছয় চুড়ায় তাহার উড়ায় পতাকা-মালা—
যাত্রীরা এসে পথের ধুলায় নামায় পূজার ডালা।
অন্ধকারের ঘন-বিচ্ছেদে বিজুলির ঝঙ্কারে,
বাজাও গভীর আঘাত-রাগিণী জীবনের তারে-তারে ;
কর চুরমার 'আমিত্ব'-ঘট স্থাপিয়াছি যাহা প্রাণে,
মাতাইয়া তোল, অলস চিত্ত রথের মত্ত টানে।
জগৎ-গাঙের শেষ মোহানাতে জানা-অজানার মাঝে
শেষ করে দাও ঝঙ্কার মম যা কিছু বেসুরো বাজে।
বালকের খেলাঘরে বসি হায় ভুলিয়া আসল খেলা,

কাল যা খেলেছি আজো খেলি তাই, মিছে কেটে যায় বেলা।
আজি এ মরতে অনাগত যারা অতৃপ্ত বাসনায়
আমাদেরি মতো ধরণীর কোণে নয়ন মেলিবে হায়,
কনকের ক্ষুধা, প্রণয়ের তৃষা সহি আমাদেরি মতো
হে চিরনবীন তব মুখে চাহি প্রশ্ন সুধাবে কতো।

হৃদ্‌সাগরের বেলায় আজিকে ঢালিয়া আলোর ফেনা,
নব পথলেখা দেখাও, সহজে যায়না যে পথ চেনা।
আজিকে ব্যাকুল মন-বিরহীর ভাবের ঝরনাতলে
পাহাড় গলিয়া প্লাবন নেমেছে উতল নয়ন-জলে।
হর হে নবীন, সব অভিমান বিচ্ছেদ-ব্যবধান,
জাগ্রত কর মানবের মাঝে সার্বভৌম প্রাণ ;
আন আনন্দ, আন গো স্বাস্থ্য, আন মঙ্গল-প্রীতি,
দুঃখবেদনা মন্দ পদে সে ছেড়ে চলে যাক ক্ষিতি।

নীল অকূলের কূলপানে ভেসে একটানা যাই চলে—
আশমানি কোন রঙমশালের রোশনিতে মন ভোলে!
আধফুটন্ত গোলাপ-কলির গোলক-ধাঁধার পথে
আঁধার তুলিছে সীমা-রেখা তার অন্তর-তল হতে।
ঢাল তুমি ঢাল পদ্মের পুটে শান্তিঝারির জল,
এই প্রাচ্যের প্রাচীন গরিমা কর কিরণোজ্জ্বল।
নিখিল জ্ঞানের মণির প্রতিভা জ্বাল বাঙালির ঘরে—
চঞ্চলা মারে অচলা কর গো আরতি-শঙ্খস্বরে।
বীণাপাণি নিজ বীণাখানি সঁপি ভকতের করতলে,
বিরাজেন যেন নবীন দেউলে করুণার শতদলে।

মঙ্গলগীতি

যেই ভারতের মহাভূমিতলে যজ্ঞের হুতাশন,
পরমোজ্জ্বল স্বর্ণ-শিখায় প্রভাসিল তপোবন,
মুরতি ধরিয়া অমৃত-মন্ত্র পুণ্য-হবির গন্ধে
প্রতিধ্বনিল ঋষির কণ্ঠে সাম-গায়ত্রী-ছন্দে ;
ওঁকার-বীজে জনম লভিল যেখানে বর্ণমালা ;
নিবেদিত যেথা বাগ্‌-দেবী-পদে পূজায় পদ্ম-ডালা
বাল্মীকিব্যাস রচিল রুচিরা কবিতা-কল্পলতা,

বেদ-বেদাঙ্গ, ব্রহ্মবিদ্যা, গীতা, ভাগবত-কথা,
গণিত যেখানে ধায় অনন্তে, অভয়ের পদ বন্দে ;
সত্য যেখানে নিত্য শোভায় মিশে সচ্চিদানন্দে ;
সেই ভারতের বেদি-মণ্ডপে ভস্মের টিকা পরি,
দাঁড়াইনু আজি মঙ্গল-গীতি-মন্ত্রে কণ্ঠ ভরি।

ভূধর কহিছে যাঁহার মহিমা মরুতের কানে-কানে,
ঝঙ্কার ওঠে নীল জলধিতে উতরোল কলতানে।
যিনি বরেণ্য, বরদ, পূর্ণ, জয়-মঙ্গল-দাতা,
লীলা যাঁর এই দ্যুলোক-ভূলোক, যিনি পিতা, যিনি মাতা।
জ্যোতি-রূপ যাঁর মণি-কাঞ্চনে রস-রূপ তরু-তৃণে,
পরিমল-রূপ প্রসূনে-প্রসূনে, ধ্বনিরূপ চিদ্-বীণে ;

জীবনে যাঁহার আনন্দ-রূপ, মন-বুদ্ধি ও জ্ঞানে,
শুক-সনকাদি নিমগন যাঁর ঐশ্বর্যের ধ্যানে,
নীল-উৎপল-দল-প্রভ-রূপ পরকাশে চরাচরে,
কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গায়, বারাণসী, পুষ্করে।
শাশ্বত যাঁর করুণা-উৎসে রচিত বিশ্ব-ব্যোম,
তারকা-ভূষণ রাশির চক্রে বিহরে সূর্য, সোম।
যিনি অক্ষর, অবারিত যাঁর প্রেম-ভাণ্ডার-দ্বার,
তাঁহারি কর্ম তাঁরে সঁপিলাম, ফলে নাহি অধিকার।

উন্মাদিনী রাই

ছুটিল যমুনা-কূলে উন্মাদিনী রাই।
একি সেই বৃন্দাবন? প্রাণ-বন্ধু নাই!
নেহারিয়া শ্যাম-কান্তি বঁধু মনে করি
আলিঙ্গিছে নব-নীপে ব্রজের সুন্দরী।
মনে পড়ে প্রাণেশের পরশ-চন্দন,
কঠিন মুঠিতে কবে টুটিল কঙ্কণ!
কুহুস্বরে মনে করি মেঘের গর্জন
চাহে নীলাকাশ পানে। বক্ষের স্পন্দন
কণ্টকিত বাহুপাশে চাপি প্রাণপণে,
কাঁদিয়া ফুলায় আঁখি শূন্য নিধুবনে।
হেরে, স্বপ্নে ফুটিয়াছে মাধবী-বল্লরী,

দোল-কুঞ্জ আলো করে কাঞ্চন-মঞ্জরি,
ঘুমাইয়া হাসে রাই, কাঁপে বিম্বাধর,
খেলিছে কুঙ্কুম-খেলা শ্যাম নটবর,
রাঙাইয়া দিল কণ্ঠে মুকুতার পাঁতি—
কনক-গিরির শিরে অরুণের ভাতি।
স্বপ্নভঙ্গে চাহে বালা নয়ন মেলিয়া,
বঁধুয়ার অঙ্গ-তাপে সুখতপ্ত হিয়া,
মুছে গেছে পত্রলেখা ;—নিশ্বাস-পরশ
শিরীষ-কপোল দুটি করেছে সরস।

আজি মনে পড়ে সেই নব-অভিসার
মেঘে-ঢাকা যমুনার এপার-ওপার,—
আলতা হলনা পরা, সঙ্কেত-বংশীর
ঝঙ্কারে চকিত-মন হইল অথির,
চুল বাঁধা রহে আধা—আরশির 'পরে,
হেরিল কান্তের মুখ অনুরাগভরে।
প্রথম প্রণয়-বাণী হইল স্মরণ,—
আচম্বিতে বাহিরিল করুণ-বেদন—
"ছেড়ে গেছ তাই ভালো, যা কর, তা ভালো,
তুমি যে আমারি নাথ অকলঙ্ক আলো।
বিমুখ হয়েছ বলে দুষিনা তোমায়—
বেঁধেছ যে প্রেম-ডোরে, তা কি ছেঁড়া যায়?
ছিঁড়িলেও মৃণালের তন্তুর মতন,
তোমাতে-আমাতে রবে অনন্ত-মিলন।
এ হৃদয় জুড়ে আছ সর্ব-মনোহর,—
এই বিশ্ব তোমারি সে রূপের সাগর!
ফুল হয়ে ফোট তুমি, মেঘ হয়ে ঝর,
মঙ্গল-সুন্দর হরি কত রূপ ধর,
কত ভাবে কত রসে বিচিত্র লীলায়,
দোলা দাও হে সুন্দর, প্রেম-হিন্দোলায়,
অন্তরের বৃন্দাবনে বাসন্তী মেলায়
মাতিয়াছে নরনারী তোমারি খেলায়।
তুমি তৃষ্ণা, তুমি তৃপ্তি, সুপ্তি, জাগরণ,
হে ঠাকুর, দাসী বলে দাও শ্রীচরণ।"

কাঁদে রাধা বিরহিনী, উন্মাদিনী রাই—
কে তারে সান্ত্বনা করে? কেহ তার নাই!

কাঁদিতে-কাঁদিতে কভু মুছি আঁখি-জল,
আচম্বিতে হেসে উঠে, ছোটে গো চঞ্চল,
কোন পথে কৃষ্ণ মিলে। অঞ্চলে-চরণে
বেধে যায়, ধায় রাধা জাগ্রত স্বপনে।
হায় রে সোনার অঙ্গ হয়ে গেছে কালি—
বড় সোহাগের রাই—এস বনমালি।
মনে কি পড়েনা হরি পল্লী-পথ-তলে,
রাধা-পদ-চিহ্ন হেরি চুম্বিতে বিহ্বলে?
রাধা-ধ্যানে রাধা-জ্ঞানে কভু আনমনে
'চন্দ্রা'রে ডাকিতে হায় রাই সম্বোধনে—
তোমা বই জানেনা যে হে করুণাময়,
কোন অপরাধে তারে ভুলিলে নিদয়?

জীবন-ভিক্ষা

(বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা-গোতমীর)

"দেউলে-দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো,
দুলালে আগলি বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস উষ্ণ সরিতে
দুর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলেনা নয়ন,—
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন!
অভাগী বিহগী দারুণ আহত
মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার
আজি কি লাগিছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন পরসাদ-
মধুরসে পরিষিক্ত!
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ,
শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ,—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু
সুধার-বিন্দু-রিক্ত?

অমরা-মাধুরী আধ-আধ বুলি ;
কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি
পুণ্য-হাসির চিহ্ন?
জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে,
ননীর পুতলি জাগিবে হরষে!
কোন পাষাণের বিষমাখা বাণে
এ নয়ন-মণি ভিন্ন?

কানন হয়েছে আমার ভুবন
সুখশশী রাহুগ্রস্ত,
ধাই দিশেহারা— রোদনের রোলে
ধ্বনিয়া উদয়-অস্ত।
যেদিকে তাকাই, বাছা মোর নাই!
প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই—
উড়িয়া-উড়িয়া শ্মশানের ছাই
ভরিল বিকল হস্ত।

প্রভু, অবনীর এই পদ্ম-বেদিতে
হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরগম পথ
ক্ষুর-ধার-সম সূক্ষ্ম।
দিলে তপোবল, মহানির্বাণ,
কুমারে আমার কর প্রাণদান—"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে
আলু-থালু কেশ রুক্ষ!

চাহেন শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত
গৌতম ধ্যান-ভঙ্গে,
অখিল-পাবন করুণা-জ্যোৎস্না
বরষি বালক-অঙ্গে—
নিমেষের তরে মেলিবে কি চোখ?
উথলি অরুণ-পুলক-আলোক,
নিবাবে আগুন কিসা-গোতমীর
শিশুহারা উৎসঙ্গে?

কহেন বুদ্ধ, "কুমার তোমার
নীরব-সমাধি-মগ্ন,

বরণ করেছে চিরসুন্দর
মরণের মহালগ্ন ;
থাকে যদি কোথা অশোক-আলয়,
ভিখ মাগি আন সর্ষপ-চয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে
পরান-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে-দ্বারে ঘুরে,
কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা,
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে,—
"শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহিনা তনয়ে আমার,
ভবনে-ভবনে ওঠে হাহাকার—
হর জগতের বিরহ-আঁধার
দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

প্রাণের ভাষা

অপমানে চূর্ণ কর আমার অহঙ্কার,
দীর্ণ কর অবিশ্বাসের পাষাণ গুরুভার—
সন্তানেরে শাস্তি দিতে, বাজাবে ব্যথা দয়াল চিতে,
তুমিই আছ বিপথ হতে আমায় ফেরাবার।
তরুণী মোর হিংসা-বধূ ভুলিয়ে নিল প্রাণ,
প্রেম যে সেথা পরাজয়ে বেদন-ম্রিয়মাণ—
মোহ-মদের মত্তহাসে, যায় সে ফিরে তোমার পাশে,
সেইখানে তার সব বিরহ-আশার অবসান।
দেখতে তোমায় পাইনে বলে সুখ তো নাহি নাথ,
কখন তব নাগাল পাব, বাড়িয়ে আছি হাত,—
ডাকছি তোমায় শূন্য জুড়ে আকাশ-ধ্বনি আসছে ঘুরে
তারার সাথে জাগছি একা প্রভাত-হারা রাত!
অশ্রু আমার অশ্রু নহে—নয়ন-পাতা-ভরা,
বিরহেরি শরৎ রাতের শিশির-কণা ঝরা,—
হৃদ্-সাগরের বেলার 'পরে, তুষার-সাদা ফেনার থরে
ফুটবেনা কি আলোর লীলা ভুবন-মনোহরা!

বাঙলা দেশের মেয়ে

ননীর চেয়ে কোমল-হিয়া
বাঙলা দেশের মেয়ে,
স্বর্গ-পুরীর স্বর্গ হেরি
তোমার পানে চেয়ে ;
তোমার আঁখি ভরলে জলে
তারা-লতায় মুক্ত ফলে,—
ধন্য হল শাঁখের অধর
তোমার চুমু পেয়ে।

টগর, বকুল, দোলন চাঁপা
তোমার খোঁপার ফুল-
কমল-বনে নাইতে নামো
এলিয়ে কালো চুল,
'পুণ্য-পুকুর' আলোয় ভরে
'সন্ধ্যা' জ্বাল মোদের ঘরে,
দোদুল সোনার কান-বালাতে
পদ্মরাগের দুল।

খেলছে আলো ভোমরা-কালো
চুলের তরঙ্গে,
হাসছে মধুর-বিজুলি-টিপ
উজল ভ্রূভঙ্গে।
আকাশ-ভরা জীবন-গানে
সুর দিয়ে যাও উতল তানে—
মূর্তি ধরে বসন্ত-রাগ
মনের সারঙ্গে।

ফুল হয়ে ওই তোমার হাসি
ফুটছে উপবনে,
চির-শরৎ-জ্যোৎস্না-রেণু
বিলাও গৃহকোণে,
অফুট মুকুল খুলে-খুলে
ভরছ মধু মনের ভুলে,
ঝঙ্কারিছে রঙ-ফোয়ারা
তোমার পরশনে।

অধর-পুটে ফুল-পেয়ালায়,
আদর-গোলাপ-বারি,—
চাইলে পরে পলক ফেল
লাজের অরুণ-ঝারি,—
আয়রে স্নেহের পরাগ-কেশর,
পরিমলের ফাগুন বাসর,
নীল আকাশের স্বপ্ন-মাখা
সোনার খাঁচার সারি।

বাঙলা দেশের বধূ তুমি,
বাঙলা দেশের মেয়ে,
তোমার দিঠি, মধুর শ্রীটি
মধুর সবার চেয়ে।
চারু-চিকন-রুচির গায়ে,
বেড়াও তুমি আলতা-পায়ে,
শিউরে ওঠে কবির হিয়া,
তোমারি গান গেয়ে।

কোথায় এমন স্নিগ্ধ-শুচি
উদার সরলতা,
আনন্দেরি মন্দাকিনীর
তরল কলকথা!
মনোহরণ তোমার লীলা
ধূসর মরুর তপ্ত শিলা
টলিয়ে দিয়ে গলিয়ে দিয়ে
ভুলায় নিঠুর ব্যথা।

পল্লী মায়ের ফুল্লমুখের
ঘোমটা খুলে দিয়ে
মিটাও ক্ষুধা হৃদয়-গলা
ক্ষীর-পশরা পিয়ে—
লো দুলালী আলোর দেশে
উষার ডালি আসছে ভেসে,
কোন মলয়ের চন্দনেরি
গন্ধটুকু নিয়ে।

দেবপূজার ফুলের সাজি
রে নির্মলা বালা,

সুধায় ধুয়ে দাও দরদীর
দুখের গরল-জ্বালা
তোমার সরল ভক্তি-মধুর
অঞ্জলিতে প্রাণের ঠাকুর
আপনি এসে পরেন গলে
মন্ত্র-পূত মালা।

আঁকচ দ্বারে লক্ষ্মী-মায়ের
পায়ের আলিপনা ,
ধানের শিষে কড়ির ঝাঁপি
সাজাও সুলোচনা :
চঞ্চলারে আঁচল ধবে
বরণ কর খেলার ঘরে,
পালায় তোমার কাঁকন-স্বরে
অমঙ্গলের কণা।

লুকিয়ে আছে তোমার মাঝে
শকুন্তলা, সীতা,
গায়ত্রী সে ভগ্নী তোমার
সাম—গীতোত্থিতা
শক্তি তুমি, কান্তি তুমি,
শান্তিময়ী তীর্থভূমি,
বিবেক-দিবার অমর বিভা
হে চিত্ত-বন্দিতা।

অশ্রু

পূর্ণিমা রাত, ঘুমিয়ে ছিলাম ঘাসের বিছানায়,
পাহাড়-কোলে শালের ছায়ায় ছিলনা আর কেউ,
মনের কানে কাঁপতেছিল বিস্মৃত পর্যায়
হাজার-বছর-আগের-বাজা বাঁশির সুরের ঢেউ ;
বঁধুর সনে মিলত গলা মধুর বেদনায়,
হাজার বছর আগেকার এক বসন্ত সন্ধ্যায়।

চুকিয়ে খেলা আকাশ-পথে একটি পথিক-তারা,
মর্ত্যবালার রূপের শ্রীতে জাগিয়ে দিল মোরে,

পাণির তলে লুকায় পাণি ; আঁখি পলক-হারা,
কি দেখিলাম স্বপ্ন-ছবি জাগন্ত-ঘুম-ঘোরে।
বনের বীণা বাজিয়ে বহে যৌবনেরি হাওয়া ;
সে যে আমার থির-বিজুরি, মায়না চোখে চাওয়া।

তারারা সব পালিয়ে গেল দিগ্-বলয়ের পারে,
সাঁঝ-সাগরের ফেনায় ভেসে বুদ্বুদেরিপ্রায় ;
আপনা ভুলে যতই ভালো বাসনু আমি তারে,
ততোই সে মোর মন ভুলাল ফুলের পশরায়।
বসুন্ধরা তাকিয়ে আছে আজকে তাহার তরে,
অশ্রু তাহার শিশির-ফোঁটা তৃণের চোখে ঝরে।

হারা

তারি চুলের গোলাপ ফুলের
শুষ্ক-ধূসর পাপড়ি এই—
এই উপাধান, শয়ন-শিথান
শূন্য আধেক—সে আজ নেই।

চক্ষে আমার বক্ষে আমার
মুখখানি সেই লুকিয়ে রাখা!—
এই বালিশের ঝালরগুলি,
তারি কালো অলক-ঢাকা,

যেখানটিতে রাখত মাথা,
চাইলে পরে পরান ফাটে,—
আধেকখানি, শূন্য আজি ;
দীর্ঘ নিশীথ একলা কাটে।

এমনিতরই চাঁদনি রাতে
বালির বালিশ শয্যা 'পরি
শুইয়ে দিলাম শেষ প্রতিমা—
অশ্রু-নদীর কিনার ভরি।

এই হৃদয়ের আধেকখানি
পুড়ল ধু-ধু চিতার বুকে,
আধ-খানিতে দারুণ ব্যথা,
শোণিত ছোটে ক্ষতের মুখে।

বসন্ত-বিলাস

আজি ফাগুন-বন-পল্লব-ছায় কোন-কোন রঙ ফুটল?
কেন কিংশুক ফুল চীন-বাস গায় চঞ্চল হয়ে উঠল?
পিক পঞ্চম গায়,
বয় দক্ষিণ বায়,
নাচে ফুল-হিন্দোল, ছন্দের দোল,—ঘোমটার জের টুটল।

হাসে সুন্দর মুখ, খঞ্জন চোখ, জাফরান রঙ অঞ্চল।
নাহি নৃত্যের শেষ,—সংগীত-রেশ, ফুল-বাণ সব চঞ্চল।
ওই আনমন চম্পায়,
মান- স্বপ্নের আবছায়
কার যৌবন-লোল হাস্যের রোল, রূপ-দর্পণ ঝলমল?

এল জ্যোৎস্নার রাত, বন্ধুর সাথ নন্দন-ফুল-শয্যা ;
খেল রঙ্গের ফাগ, চুম্বন-রাগ—লজ্জায়-লাল লজ্জা!
মধু মল্লির সৌরভ,
চুমে কুন্তল-গৌরব—
ওরে চায় প্রাণ-মন আপনার জন, বন-ময় ফুল-সজ্জা।
ওরে কঙ্কণ-সুর ঝঙ্কার তোল, আয়, ফুল-মৌ পান কর,
জাগে বংশীর তান, হর্ষের বান, রাত-ভোর-গীত নির্ঝর ;
খোল কাঞ্চির বন্ধন,
হোক উন্মাদ ঘূর্ণন,
খুলে দিক-ওড়নার কাঞ্চন-পাড় কন্দর্পের ফুল-শর।

ওরে খোল অর্ধেক-উন্মীল চোখ, অঞ্জনে আর কাজ নেই,—
ওলো আলতায় লাল পা'র তল তোর, মঞ্জীর ঠিক বোলবেই।
এল উৎসব-লগ্ন,
আধ- তন্দ্রায়-মগ্ন
জাগে বল্লভ তোর বক্ষের ঠাঁই, ধ্যান-সুন্দর আজ সেই।

বুকে তাল দেয় ওই রত্নের হার—ডুব দেয় সব অন্তর,
আঁকি চন্দন-রস-আল্‌পন আজ জপ কর প্রেম-মন্তর,—
মুখ মন্দার-গন্ধী,—
প্রিয় দর্শন-নন্দী
ওই কজ্জল চোখ যৌতুক দিক উদ্বেল প্রাণ, মন তোর।

লুকোনো ছবি

"সেই কিশোরীর হাসির আলো খুঁজছি কাঁচা বয়েস থেকে,
উর্বশী বা তিলোত্তমা হিংসে গো যার রূপটি দেখে,—
ভালোবাসার বুলবুলিটি
দিয়ে গেল উড়ো চিঠি,
সে এক রঙিন শাওন বিহান—হাসছ তুমি রঙ্গ দেখে?

মন যে আবার সবুজ হয়ে উঠল গো তার খবর পেয়ে,
শরম-গুটির রেশমি শাড়ি মিশিয়ে আছে তার সে দেহে ;
সূক্ষ্ম হিসেব করলে দেখি,
আসছ তুমি চালিয়ে মেকি,—
শপথ করেই বলতে পারি সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

আজও প্রিয়ে বুকের ভিতর রসের উজান-ফল্গু চলে,
তার সে খোঁপার পাপড়ি চাঁপার ঝরছে প্রাণের রঙমহলে,
কণ্ঠ তাহার কি যে মিঠে,
ছিটায় আনার-দানার ছিটে,
নটকানো রঙ আঁচল ফুটে রূপ-দরিয়া পড়ছে ঢলে।

নিন্দে কেবল করবে তুমি, বলবে নিলাজ প্রগল্‌ভা সে,
হার মানে তার রূপের দেমাক, সাচ্চা তোমার প্রেমের পাশে।
ও সব কথা নিক্তি ধরে
দেখতে কে যায় ওজন করে?
তুমি গো মোর ভরা ভাদর, ফাগুন মাসের দক্ষিণা সে।

ও কি সখী রাগ করিলে? কিন্তু সে মোর রাগ করেনা,
সে যে আমার আঙুর-মধু, অনুরাগের হাসনুহেনা।
তোমার মতো নয় সে মোটে,
যাচ্চ তুমি বেজায় চটে,
চললাম আমি তার নিকটে, চুকিয়ে তোমার পাওনা-দেনা।"

"ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে যে, সঙ সেজেছেন বুড়ো হয়ে,"
চোখ ঘুরায়ে কহেন প্রিয়া,—"একেবারে গেছে বয়ে,
চল্লিশেতে চালশে-ধরা,
ঝাপসা চোখে চশমা পরা,
যৌবনেরি লক্ষণ এসব, পড়তে পার প্রেমের মোহে।

বারেক শুধু দেখাও তোমার পোড়ার-মুখী কল্পনাকে,
বলিহারি পছন্দ তাঁর—করতে পেযার চান তোমাকে?
মরতে কি তার জায়গা নেই আর,
প্রেম করা বার করব গো তার,—
বুড়ো খুকী দেয়ালা করেন, মন মজেছে গোঁফের পাকে।"

জবাব দিলাম,—"ফটো যে তার রয়েছে মোর ডেকসটিতেই,
সে যে তোমার সতীন প্রিয়ে, সে মুখ তোমার দেখতে তো নেই।"
যেমনি ফটোর খবর পাওয়া,
উল্কা-সমান করেন ধাওয়া,
ডেকস-দেরাজ ফেলেন খুলে—রিং-টি ছিল অঞ্চলেতেই।

তব সহেনা, ছড়িয়ে-ছিঁড়ে চিঠির তাড়া, কাগজ, ছবি
ঘরের মেঝেয় ওলট-পালট, একশা করে ফেলেন সবি।
আলগা খোঁপা গেছে ক্ষেপে,
মুক্তাদাঁতে অধর চেপে,
খোঁজেন ফটো—কইনু ওগো,—"সইতে নারি বেয়াদবি।

দিচ্ছি আমি বাহির করে ওই জাপানি বাক্স থেকে
মুণ্ড ঘুরে যাবে এখন, তার সে চোখের ভঙ্গি দেখে,
ডালার তলেই আছে আঁটা,
সেই তোমারি সতীন-কাঁটা,
মন যে আমার করলে দখল কনক-চাঁপার রঙটি মেখে।"

দেখেন ডালার উল্টাপিঠে প্রেয়সী তাঁর নিজের মুখ,
উঠল ফুটে আরশিটিতে রূপের আলোর গুমরটুক।
জল-জমা সেই চোখের পাতায়
অভিমানের মুক্তালতায়
অপরূপ এক ধরল শোভা অশ্রুমাখা হাসির সুখ।

পূজারিণী

কোন মহাকাল-মন্দির-পথে
চলেছ একেলা রানী,
আদরের গুয়া-চন্দন-চুয়া
উপহার-ভরা পাণি?

বিরূপাক্ষের কিরীটের ভাতি
উজলিবে বধূ-বরণের রাতি,
চির-জীবনের ধ্যান-সুন্দরে
নিবেদিবে ধূপ-দানী।

মধুমঞ্জরি ঝরিয়া-ঝরিয়া
পথরেখা দেছে ঢাকি,
চরণ ফেলিছ ঝরো পাপড়িতে
কাঁপিছে পরান-পাখি।
কবে সে তোমার পাষাণ-দেবতা
পূজারতি-শেষে কহিবেন কথা?
গাহন করিবে অমিয়া-সায়রে
ধেয়ানে মুদিয়া আঁখি।

স্নেহলতা

সঙ্গোপনে গৃহের কোণে
করল বিরাট পণ,—
'রাখব আমি বাপের ভিটায়—
লক্ষ্মীর আলিম্পন।'
লুকিয়ে ছিল যে মর্যাদা
নারীর হৃদয়-তলে,
উঠল জাগি দিগ্বিজয়ী
বীরের অটুট বলে।
যুক্ত-করে অশ্রু-মাখা
দিব্য হাসি হেসে,
করল বরণ অগ্নিদেবে
নববধূর বেশে।

জন্মভূমি-দেবীর পদে
লুটিয়ে দিল শির,
রক্ত-ফেনিল ভস্মরাশি
উড়ল কুমারীর।

ঝলসে গেল শিউলিকলি
নীল আকাশের তলে,

বাঙলা দেশের ফুল-বাসরে
উঠল আগুন জ্বলে।
ব্রাহ্মণদের সর্বত্যাগে
যে দেশ সমুজ্জ্বল,
দয়ামায়ার গঙ্গা-ধারায়
যে দেশ নিরমল,
সেইখানে হায়, সেই সমাজে
নূতন কন্যা-বলি,—
বুদ্ধি-বিবেক-ধর্মনীতি
চরণতলে দলি!

মাতৃস্তোত্র

কিরণে-শিশিরে-কুসুমে-ধান্যে তরুণী,
অয়ি মা ভরণী, অমৃতস্তনি ধরণী,
ত্রিভুবন-মনোহারিণী,
অয়ি সুরধুনী-ধারিণী,
শোভন-শান্ত উজ্জ্বল-শ্যাম-ভূষণা,
গগণপ্রান্তে-লুণ্ঠিত-নীল-বসনা—
নমো-নমো মম জননী।

কোথা বসন্ত এত বিচিত্র—স্ফুরিত,
শুভ্রোজ্জ্বল, সৌর-কিরণচ্ছুরিত,
পঞ্চম তান ধ্বনিত,
সুরভি-সমীরে স্বনিত!
এত বীণাবেণু নন্দিত দিনযামিনী!
সীতা-সাবিত্রী পতিরতা পুরকামিনী,
কোথা এত প্রীতি-ঝরনা
নূপুরাশিঞ্জি-চরণা!

কোথায় বর্ষা এমনি অভ্র-গভীরা!
গাহে সাম-গাথা বিরাট কণ্ঠ কবিরা
মন্দ্র-মধুর করিয়া!
পরান ওঠে গো ভরিয়া!
এত ধারা-জল-ভরা সুশীতল সরসী,

কোথা ফোটে বলো সহস্রদল রূপসী!—
অতুলনা তুমি অয়ি মা,
ত্রিভুবনে-রূঢ়-মহিমা।
কোথায় শরদে গগন অমনি নীলিম!
আগমনী-গীতে শুভ উৎসব অসীম
শুভ্র জোছনা-হাসিতে
অতসী—শেফালিরাশিতে!
কোলাকুলি কতো বিজয়ার সেই নিশিতে,
হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ চাহে মিশিতে।
কোথা ততো সুখ-সরণি,
অয়ি দয়াময়ি ধরণী!

কোথা হেমন্ত, কুন্দ শিশির-তৃষিতা!—
কুহেলিকা-ঢালা হিম-নিশীথিনী সুশীতা
পুরজনে মিলে যাপনা!
আরামে কৃশানু-তাপনা!—
মার করুণায় স্তন্য-কণায় লালিত,
অক্ষয়-কণ অন্ন-ভুবনে পালিত,
ওরে কে আছিস? ছুটে আয়,
মার পরসাদ লুটে যায়!
গত-গৌরব-গিরির শেখরে গলিয়া,
এস প্রেম-রূপে তুষারের স্তূপে স্খলিয়া,
পড় অজস্র ঝরিয়া,
গঙ্গা-মেঘনা ভরিয়া।
কতো কাল থেকে কেঁদে-কেঁদে আঁখি ফুলেছে!
প্রলয়ের রোলে হৃদি-হিন্দোল দুলেছে!
উঠেছে জলধি জাগিয়া
নবেন্দু-সুধা লাগিয়া!

জনম-দুখিনী জননীর আঁখি মুছাতে,
মণি-কুন্তলা মায়ের দৈন্য ঘুচাতে
গৃহে-গৃহে আজি কর পণ,
দুষ্কর তপঃ আচরণ।
মায়ের চরণে ফুলমালা দাও জড়ায়ে,
মায়ের ভাষায় আপনারে দাও ছড়ায়ে
দিশে-দিশে, দেশ-বিদেশে,
নব মঙ্গল-নিমেষে।

দোল-স্বপ্ন

চাঁদের রঙে ডুবিয়ে আঁচল,
ফাগের গুঁড়া মেখে,
ঝুলনাতে ফুল ঝুরিয়ে দিয়ে
খেলবি তোবা কে-কে?
এমন মায়া-পূর্ণিমাতে,
শুনবি সারঙ রঙ-খেলাতে,—
রাঙা আঁচল ভাসিয়ে দিবি
নীল দরিয়া ঢেকে।

রঙ্গ করে কঙ্কণেবি
মনচোরা ঝঙ্কার ,
মদির-আঁখি ব্রজবালার
বিলাস-অভিসার।
রসের সায়র নিছিয়ে পায়
নিখিল-গোকুল আঙিনায়
বরণ করে পরবি গলায়
কলঙ্কেরি হার।

বাজল বুকে লাজের কাঁটা,
রক্ত ছুটে তায়,
রাঙিয়ে দিল কোন দরদী
কুঙ্কুমেরি ঘায়?
বন-পথে কোন স্বপ্ন-ভোলা
টাঙিয়েছে গো নতুন দোলা,—
ফাগুন-বীথি মধুর হল
হাসির ঝরনায়।

গানে গানে শিউরে উঠে
সেই পুরানো পথ,
উধাও ছোটে রাই-কিশোরীর
তরুণ-মনোরথ।
দিনের ঢেউয়ে বনের কোণে,
চির-আপন অচিন-জনে,
পরদেশিনী আলতা-রাগে
লিখিয়েছে দাসখৎ!

আদর-রাঙা ফাগুয়াতে
রাঙাও বঁধুর হিয়া।
বুকের তলে সুধার রাশি
উঠুক উছসিয়া।
লাল-সাগরের ফেনা লেগে
অশোক-কলি উঠল জেগে,
বন-মাধবী গরব করে
গন্ধ বিলাইয়া।

কোন ভামিনীর লালচে ঠোঁটে
সকাল যেন সাঁঝ?
পিচকারিতে—কালিন্দীতে
ভরা জোয়ার আজ।
এলো চুলে গোলাপি জল
তিতিয়ে দিল আঁখির কাজল,
ঝিকমিকিছে আবির-কণায়
চিকন শাড়িব ভাঁজ।

হাজার যুগের ফাগুন-রাগে
কিশোর আগুয়ান,
ফুলঘরের দেওয়াল-ফাঁকে
হানে বিনোদ-বাণ।—
আজকে ব্রত-উদ্‌যাপনে
মন মিলায়ে বঁধুর মনে,
পূর্ণ ঘটে স্বর্ণ শ্রীফল
অর্ঘ্য করে দান।

বঁধুর লাগি বেলাবেলি
জলকে চলে আসি,
বিহান ভরি গহন করি
এলিয়ে চুলের ফাঁসি।
দুষ্টু অলি কালো পাখা
ঝরিয়ে দে যায় খোসবো-মাখা,
কামিনী-ফুল-পাপড়ি-ঝরা
কোমল-মিঠে হাসি।

আজকে ব্রজের দূর্বা-শেজে
তিল ঠাঁই নেই আর,

হালকা হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে
মিনি-সুতার হার।
মন লাগে না ঘরের কাজে,
নতুন নেশা ফুলের ঝাঁজে—
ফাটিয়ে বাঁশি ডাক দিয়ে যায়
আচমকা ঝঙ্কার।

হাসি দিয়ে করব খুশি,
তুষব আরতিতে,
পূজব চুয়া-চন্দনে তায়
সোনার তুলসীতে।
শরম টুটে সুখ জেগেছে,
নীল কাজলের ঢেউ লেগেছে,—
চমকে উঠি বন-বিহারীর
দোল-দোলনের গীতে।

বঁধুয়াকে ঘিরি সবাই
গাইছে মনের সাধে,
গায় কখন চড়া গলায়,
কভু কোমল খাদে।
হরিণ-শিশু খেলছে পাশে,
রাঙা ধুলোট সবুজ ঘাসে,—
চরণ কাদের যায় রে বেধে
ঝুরো-ফুলের ফাঁদে।

তাল-ফেরতার তালে-তালে
পাঁয়জোরে জোর বোল,
সারা আকাশ রঙিন করে
দোলায় রাঙা দোল।
আজকে দিব অঞ্জলিয়া
মধুরাতের 'নোমালিয়া',—
নাথের মিলন-সঙ্কেতে সই
শোণিত উতরোল!

শেষ

কারা যেন আসে সরে
অশ্রুকণা বিদ্ধ করে
    চোখে পড়ে মুখের 'আদল'
নিবন্ত চাঁদের ফালি,
গলে পড়ে জ্যোৎস্না-কালি,
    প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

আজিকে ভিতর মোর
ছেয়েছে বিষের ঘোর,
    বাহিরের মেলা ভাঙিয়াছে,
ওই বাহিরের সাড়া
হয়ে গেছে আমা-ছাড়া,
    চোখের জলের ঘষা কাচে।

পূর্ণিমার কোন পারে
ডাকে যেন কে আমারে,—
    লুপ্ত অজগর রাত্রি-রূপ ;
মৃত্যু সে চুমকি-প্রায়
ঝিকিমিকি নিবে যায়,—
    প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।

আজ শুধু মনে হয়,
মানবের এ হৃদয়
    বাজায় গো কোন জাদুকর?
সুরে-সুরে মিলাইয়া,
ঝঙ্কারিয়া, উছলিয়া,
    উদ্বেলিয়া যুগ-যুগান্তর।

ফিরে চাওয়া

নতুন চাওয়া চাওগো ফিরে এই চাওয়া কি শেষ চাওয়া?
আকাশ ভরা তারার আলোয় চোখের তারার গান গাওয়া?
মনমহুয়া ফুলের মদে মূর্ছা গেল জ্যোৎস্না-বৌ,
লাবণ্যে কার হার মেনেছে হাসনুহানার টাটকা মৌ!

কই সে চাওয়া সাধ মেটানো! খুশরোজে কি খেয়াল শেষ?
পরদেশীয়া দরদিয়া কে ভাঙিয়ে দিল তন্দ্রারেশ!
ডাকবো ফিরে? ডাকতে মানা কান্না আমার কণ্ঠহার!
সুর্মাতে কে করলে নীলা ফটিক চোখের জলবাহার!

শূন্য শেজে দীপটি জেলে তার আরতি, তাই চাহি—
সেই গোলাপি পদ্মহাসি, নীল নয়নে নিদ নাহি!
কার মালাতে পড়ল গাঁথা কাঁচল ঢাকা উল্কারা?
চিরনারী-পরশমণি, নন্দনেরি ফুল কারা?
কাঁদন-ঝরা একলা বাদল বাঁশির সুরে ফুঁপিয়ে গায়—
ওরে—ব্যথার সুরে সুরবাঁধা কি এতই সোজা হায় গো হায়।

সে

ওগো মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলিয়ে কে—
এই দিল-ভোলাকে পাগল করে ভুলিয়েছে?
ওই সন্ধ্যাতারা চেনে গো তার সন্ধ্যামণির দুলদুটি—
ওরে ক্ষ্যাপা হাওয়া পালায় চুলের ফুল লুটি।

আজি তার বিরহের বেদন বাজে এই বুকে,
মরি তারই অধর-সুরার সুবাস মোর মুখে ;
দুটি কালো আঁখির কটাক্ষে সে পূর্ণিমাকে ভুলিয়েছে,
ঘাটে জল-ভরণে মৌ-যমুনা গুলিয়েছে।

সে যে চাঁদনি-গাঙে একলা খেয়ায় পেরিয়েছে,
আজি তার তরী হায় বার দরিয়ায় বেরিয়েছে।
শোন শারেঙ্গীতে সুর বেঁধেছে মূর্ছনায়,
গীতে তাল দিতে তার নীল ঢেউয়েরা লজ্জা পায়।

সে যে চিরকিশোর ফাল্গুনেরি পাট-রানী,
ফুলে সাজিয়েছে মোর মধুরাতের ফুলদানি,
ও সে গোলাপময়ী কোন বসোরা রূপ-পশরা দেয় ডালি,—
করে অপ্সরীরা তার মিলনে ঘট-কালি।
ভরা ভাদর-সাঁঝে আদর-ফোটা 'গন্ধফলী' বিলিয়েছে ;
আহা ভোরের বায়ে আজ কোথা সে মিলিয়েছে!
কোন সোনালি জেসমিনেরি বেশমি কেশর উল্লসি!
হাসে গোরোচনা-গৌরী-রূপের উর্বশী!

এল বরণ-বেলা গন্ধ-মালায় চন্দনে,
বাজে জংলি 'পিলু' যৌবনেরি নন্দনে,
জাগে জ্যোৎস্না-বঁধুর উলুধ্বনি বকুল-বনের আবছায়ে,
শুনি প্রথম লাজে নূপুর বাজে তাব পায়ে!

আমি পড়নু আদি-কাব্যখানি তার সে জাদু ঈঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্ণভাতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গিতে,
কাঁপে লক্ষ যুগের পদ্ম-ফোটা ঠোঁট দু-খানি থরথরি
সে যে চুম দিলরে পঞ্চশরে জয় করি।

ফিরে এস গো মোর সাগর-মথা ফুল্লরা
সখী, জাগো বারেক জীবন-পথের দুখ্‌হরা ;
এই জগৎ-নাগের বিষের জ্বালা বুকের মাঝে জড়িয়েছে—
ঝড়ের হাওয়া বেলকুঁড়িদের ঝরিয়েছে।

দুম্‌কারানী

পাহাড়ঘেরা বাঁধের তীরে পথ ফুরাল শেষরাতে
সামনে দূরে উচ্চ চূড়া দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নাতে।
কালকে রাতে প্রহর জাগি
এসেছি আজ যাহার লাগি
সেই মোহিনী ঘুমায় তখন শিরীষ-কেশর-শয্যাতে।

সন্ধ্যাতারার আলোক থেকে জ্বালিয়ে আপন দীপখানি
ঘুমিয়ে আছ দুম্‌কারানী এলিয়ে তনুর ফুলদানি।
অফুরন্ত ধূপের বাসে
মৃগনাভির গরব নাশে,
পালিয়ে গেছে তিলোত্তমা কটাক্ষে তার হার মানি।

ঝরনা-ধারা গাইছে গো তার নূপুর-পরা পা'র কাছে,
ভোরের পাখি উঠছে ডাকি—ফুটছে আলো শাল-গাছে।
মৌয়া-ফুলের মদালসে
ওড়না-খানি গেছে খসে
তখনো তার মুখের 'পরে জরির চিকন জাল আছে।

আসমানি-নীল কাঁচলি তার শিউরে ওঠে উচ্ছ্বাসে,—
অন্তরে বয় আবেগ-তুফান, বাইরে তাহার ঢেউ আসে!
বসন্তিয়া পরদা টানি
স্বপন দেখে পরীর রানী,—
রঙান হিয়া নিঙাড়িয়া দিলাম আজি তার পাশে।

চির-যুগের কান্তা আমার, প্রাণ-প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সিঁথির মণি, শিথিল বেণীর নীল ফিতা।
নিমন্ত্রণেব পত্র লিখে
পাঠিয়েছিলে এই পথিকে,—
শুনব মধুর কণ্ঠ তুহার, জাগো ফাগুন-পুষ্পিতা।

তোমার রূপের দরবারে আজ ভেট দিনু এই বরণ-হার,
চারুচোখের চোরা দিঠি চমকে দেছে দিল্‌ আমার।
তোমার পাণির তড়িৎ-ভরা
দাও পরশন তরুণ-করা,
ঘুচাও মম অকাল-জরা খোলো শৈলপুরীর দ্বার।

লো পাষাণী, এই প্রবাসে একটু বস মোর সাথে,
হোক দু-জনে চোখো-চোখি নীল পাথরের পইঠাতে।
গরিব-খানায় খেয়াল-সুরে
আমিই না হয় ছিলাম দূরে,—
তুমিই বা কোন ডাকলে মোরে বকুল-ঝরা দোল-রাতে?

কুঞ্জে যখন ক্ষ্যাপা পবন, লুটত মধু জুঁই-ফুলে,
স্বপন-ঘোরে তখন মোরে গেলে আমায় স্রেফ ভুলে!

সেদিন তোমার এই লাবণি
লুকিয়ে কেন রাখলে ধন!
তাকাওনি তো হায় সজনী, কওনি কিছু চোখ তুলে!

দিনের রঙে এই দুনিয়া ঝাপসা দেখে যার আঁখি,
আবছায়ারা আলপনা দেয়, ফিরতি বেলার নেই বাকি ;
শুক্ল কেশে অতিথ সাজি
পরদেশীয়া ডাকছে আজি—
ওই দেখ তার প্রিয়তমার লাজ ভেঙে দেয়ে বন-পাখি।

আবার নব কিশোর হব দাও রসায়ন, সুন্দরী,
চল কুটির-আঙিনাতে সোহাগ-সিঁদুর-টিপ পরি।
ফিরবনা সই—ফিরবনা লো,
সঙ্গ তুহার লাগছে ভালো,—
জীয়াও তারে দরদ-ভারে গিয়াছে যার মন মরি।

রাখ আমার শেষ মিনতি, ছল করোনা নিঠুরা,
সুর মিলায়ে দাও গো বেঁধে তার-ছেঁড়া মোর তান-পূরা
গাইব গীতের শেষের কলি,
রস-লহরী দাও উথলি,
তৃষাতুরের পেয়ালাতে দাও গো ঢালি শেষ সুরা।

আধ-ঘুমানো মুখে তোমার হাসি-টুকুন লুকিয়োনা ;
উদাস হয়ে বাঁকিয়ে গ্রীবা সাধের মালা শুকিয়োনা ;
এই যদি শেষ ছিল মনে,—
বিদায় দেবে আপনজনে,
মিথ্যা কেন আমায় তবে করলে হেন উন্মনা!

ওই অলকে, ওই কপোলে, অপাঙ্গে কি ভঙ্গিমা!
অভিসারের ললিতবেশে বিলাস-লীলার নেই সীমা।
নুর-জাহানের রূপ জিনিয়ে
নিলে যে মোর মন ছিনিয়ে!—
চুনির মত দাও রাঙিয়ে অনুরাগের রক্তিমা।

'দুধ-পাথরে' তোমার নিখুঁত মূর্তি গড়ি নির্জনে,
আঙুর-মিঠে অধর-পুটে পিয়াস মিটাই তন্মনে।
জনম-জনম এমনি করে
লুকাও দূরে কাঁদিয়ে মোরে,
দাগ রেখে যায় তোমার ছায়া আমার স্মৃতির দর্পণে।

আজো ফোটে তেমনি শোভায় বনগোলাপের লাল কুঁড়ি।
নিথর হয়ে প্রজাপতি বসে গো তার বুক জুড়ি।
বাঁধের ঘাটে 'পূর্ণিমা' সে
চুপি-চুপি নাইতে আসে,—
গুমরে উঠি শুনি যখন বাজে তরল জল-চুড়ি।

জাগাও তৃষা জাগাও তৃষা জাগাও লো ষোড়শী সঙ্গিনী,
ঘূর্ণি হাওয়ায় অনেক ঘুরে এলাম চলে পথ চিনি।
তোমার পানে চেয়ে-চেয়ে
আফসোসে চোখ আসছে ছেয়ে—
কেন মদির যৌবনে মোর দাওনি ধরা রঙ্গিনী!

পঞ্চকোটে

ফিরিয়া এসেছি ফের সেই দারুকেশ্বরের স্বপ্নময় তীরে,
এ পিয়াল-শাল-বনে রাখ মোরে এককোণে পাতার কুটিরে।
দিগন্তে ফিরোজানীলে কে তুলি বুলায়ে দিলে গাঢ় নীলিমায়—
হেরি সুপ্ত সিংহসম পঞ্চকোট দীপ্ততম পৌরুষ-প্রভায়!

ওই সে গৈরিক-রাঙা তরঙ্গ পাষাণ-ভাঙা আবর্ত-কল্লোল
পশিয়া মনের কানে আবার অসাড় প্রাণে দোলায় হিল্লোল!
সেই তরুগুলি মোরে তেমনি ইশারা করে বসিতে ছায়ায়—
যেখানে বালক-বেলা খেলেছি সুখের খেলা ধুলা মেখে গায়!

হেথা কবিতার পরী নন্দনের জাদুকরী জাগাইত মোরে,
মেলিত ফুলের পাখা কোজাগরী জ্যোৎস্নামাখা সে নব-কৈশোরে!
কুঞ্জ-ছায়া-অন্তরালে নূপুর-গুঞ্জন-তালে নাচিত ঝরনা!
অপরূপ অঙ্গে তার লীলায়িত মুক্তাহার উড়ন্ত ওড়না!

নয়নে সে মায়ামণি নিভে গেছে ; দিন গনি আজি অবেলায়,
এসেছি অতিথিবেশে পূরবীর সুরে ভেসে বেলা যে ফুরায়!
পিছুপানে ফিরে চাই সে স্নেহের নীড় নাই সে পুণ্যকুটির—
চিহ্নহারা মোর কাছে শুধু শূন্য স্মৃতি আছে ব্যথা সুগভীর!

যে ব্যথা মর্মের মাঝে পরতে-পরতে বাজে গুমরে অন্তর!
অদৃষ্ট-প্রচেষ্টা-কাল হরিয়াছে অন্তরাল তিরিশ বৎসর!

হে পল্লী 'কল্লোলী' মোর তব শ্যাম-স্নেহডোর এনেছে টানিয়া!
মোরে এই পরবাসে পর এসে ভালোবাসে সোদর মানিয়া!

বহিছে প্রসন্ন হাওয়া, পাখির কীর্তন গাওয়া নয়ন গলায়—
চাষির আনন্দ-বাঁশি, শিশুর সরল হাসি বটের তলায়।
অদূরে শারদ মেঘে, জলধনু আছে লেগে দীপ্ত গিরিচূড়া—
হের দূর দিগ্বলয়ে রয়েছে ধূমল হয়ে নীলাঞ্জন-গুঁড়া!

এ মোহন মঞ্জুছবি আঁকে কোন আদি কবি যুগ-যুগ ধরে—
ছায়া-রৌদ্রে হিল্লোলিত নীলারণ্য মর্মরিত পল্লবের স্তরে।
এসেছি পরম ক্ষণে এই বনে পদ্মাসনে বসিব পূজায়—
এ মঙ্গল-নিকেতনে উপাসিব শান্তমনে ইষ্ট-দেবতায়!

নমি মা কল্যাণী তারা অমৃত-নির্মাল্যধারা পরসাদ দানে—
ঘুচাও কুমতি মোর মুছাও আঁখির লোর শান্তি ঢাল প্রাণে।
ভেঙে দে আমার ভুল এ পঙ্কে ফোটা মা ফুল তোরই রাঙা পায়!
সমর্পিব মনে-মনে জানিবেনা কোন জনে হেথা নিরালায়!

দে মা দেখা গৌরীরূপে শাঁখারিকে চুপে-চুপে কবে দেখা দিলি।
বসি, কোন শিলাতলে হাসি-মুখে খেলাছলে শাঁখা পরেছিলি।
পার হয়ে গিরি-নদী এ প্রান্তরে মেলে যদি সাধনার ধন,
কেদার-গঙ্গোত্রী-নীরে মোর চিত্ত-শঙ্খটিরে, করিব পূরণ।

অমিতাভ

নমি অমিতাভ বুদ্ধ-বিভূতি, হে মূর্ত ত্যাগ করুণাময়,
সত্য-সন্ধ বিবেক-দীপকে নিখিল-কুহেলি কর গো ক্ষয়।
কোন পশুঘাত-যজ্ঞশালায় খড়্‌গের তলে লুটায়ে শির,
উপাড়ি ফেলিলে যূপদারু-মূল, হরিলে ধরার বলি-রুধির!

বাজালে শঙ্খ রাজ-সন্ন্যাসী, অলকার ভোগে নিলে বিদায়,—
কুমারের আঁখি প্রেয়সীর রাখি ভুলাতে তোমারে পারেনি হায়,-
ফল্গু-বেলায় গহন গুহায় মৌন হাসিটি ধ্যান-মগন,
জটাজুটে তব বাকল-ভাবিয়া নীড় বেঁধেছিল বিহগ-গণ!

নিরঞ্জনার অভিষেক-জলে কবে সারা হল অবগাহন,
আভীরী মেয়ের পরম-অন্নে হলে প্রসন্ন ভয়-তারণ।

জীবনের মরু-রৌদ্র জুড়ালে ত্রিতাপ-হরা সে চন্দ্রিকায়,
বিশ্ববোধনী আনন্দ-বাণী মুক্ত অশোক-পূর্ণিমায়।

নমি নির্বাণ-তন্ত্রের ঋষি, তোমার তপের ভর্গ-দীপ
ফলিতে 'গৌরী-শঙ্কর'-চূড়ে উজলি পূরব-অন্তরীপ,
বাজিছে মৈত্রী জয়-জয়ন্তী পুণ্য পবনে পাবন গীত,
শত মঠে শত হৈম-দেউলে আরতি তোমার বিশ্বজিৎ!

তিমির-হরণ রসাঞ্জনীতে অকলুষ করি দাও এ-চোখ,
সপ্ত-দ্বীপার পদ্মবেদিতে দীক্ষা তোমার ধন্য হোক।
স্বপ্নাহতের তন্দ্রা টুটিলে পলায় স-সাজে অলীক দুখ,—
মায়া-সরসীর মরীচি-পানীয়ে জুড়ায় কি কভু তিয়াষী বুক?

দুঃখ কখন অ-দুঃখ হয় দ্বিধা-চঞ্চল কাঁপেনা প্রাণ,
নিবাত-প্রদীপসম যেন হই, কর ভিক্ষুরে বর-প্রদান!
বাসনার বীজে ভ্রণরূপে আর কে চাহে হইতে পুনর্জাত
কোথা জ্বালা-মুখী-শিখা নির্বাণ? দাও জয়কেতু হে মহাতাত

রবীন্দ্র-আরতি

(জয়ন্তী উৎসবে)

জয়ন্তী প্রতিভাচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া, বিশ্ব চমকিয়া,
ভো রবীন্দ্র বাগীশ্বর, বাণী তব অবিস্মরণীয়া।
সপ্তাশ্বের রশ্মিকরে এই পূর্ব-আশার সৈকতে
কি অ-পূর্ব আবির্ভাব দীপ্যমান হিরন্ময় রথে!
যশের দুন্দুভি-তূর্যে দিঙ্-মণ্ডলে আরতি তোমার,
নমস্তে বিরাট-কণ্ঠ, চিরঞ্জীব, কবি-অবতার।
যেমতি পঙ্কিল নীর মিশি পুণ্য জাহ্নবী-লহরে
হারায়ে মালিন্য তার দেবতার পূজা-ঘট ভরে,
তেমতি তোমার রস-নিষ্যন্দিনী ধারার বর্ষণে
নন্দিত নির্মল হয়ে বন্দি তোমা এ পরম ক্ষণে।
শ্রদ্ধাব অগুরু-ধূপে পূজা দিতে আসিয়াছি আজ,
নির্বাক করেছে চিত্ত উৎসবের ভেরির আওয়াজ ;
শঙ্খ সে দক্ষিণাবর্ত মুখর মঙ্গল-সমীরণে,
ক্ষম দোষ, ঘটে যদি ভকতের মন্ত্র উচ্চারণে।

মনে পড়ে একদিন পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার
শুনেছি তন্ময় হয়ে তব দৈবী বীণার ঝঙ্কার।
সুন্দরের মন্ত্র দিলে তরুণের স্মৃতি-রন্ধ্র-পথে,
ধ্বনিল উদাত্ত গ্রামে মরমের পরতে-পরতে,
দিয়াছিলে পরসাদ, পেয়েছিনু চরণের ধূলি,
আজও সেই গর্ব জাগে, ভুলি নাই স্নেহস্পর্শগুলি।

প্রসীদ হে দীক্ষা-গুরু, তব তপো-নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
হোম-বৈশ্বানর-সম অপ্রকাশে করিল প্রকাশ ;
অচিহ্নিত অনুদ্দেশে চিনিয়াছ আলোর স্বাক্ষর,
সার্বভৌম প্রতিষ্ঠায় বিদ্যোতিত উষ্ণীষ ভাস্বর।
সীমা হতে যাত্রা তব অসীমের অদৃশ্য উরসে,

ভাবের প্রশান্ত মহা-সমুদ্রের অতল-পরশে।
মৃত্যুঞ্জয় শৌর্য তব, বরপুত্র 'বিশ্ব-ভারতী'র,
আপনা হইতে অই পদযুগে নত হয় শির।
ইন্দ্রচাপ নিন্দি তব কল্পনার কার্মুক টঙ্কারি
উদ্ধারিলে মহানিধি, রত্নাকরে দূরে অপসারি।
বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ-ভাগে লভিয়াছ ন্যায্য অধিকার,
অক্ষয় তোমার কীর্তি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা নাহি তার।

গৌরবের 'গৌরীশৃঙ্গে' আরোহিয়া হে জিতাত্মা বীর,
পদ্মময় পাত্র কবে দুহিয়াছ কল্প-ধেনু-ক্ষীর।
যে বিচিত্র অমরীরে যৌবনের রাখি-পূর্ণিমায়
পরাইলে রাঙা রাখি, সে অনিন্দ্যা বরিল তোমায়
স্বয়ংবর-সভাতলে, প্রাণ-লক্ষ্মী, চিরন্তনী বধূ
যুগে-যুগে নিবেদিল উন্মাদন 'মহুয়া'র মধু।
অদ্বিতীয়া জাদুকরী, কবরীর একবেণী তার
মুক্ত করি জড়াইলে মুকুতার হার ;
আলাপিলে সাথ তার পূরবিয়া নারাঙ্গীর বনে,
আধ-পরিচয় ভরা, আধ-ভোলা জাগর-স্বপনে।
জীবনের অপরাহ্ণে, কবিতার দিবা-স্বপ্ন পারে
তারি সে গোলাপ-কলি কবে ঢলি পড়িল পাথারে!

তোমার 'ব্যথার পূজা' আজো কবি, হয়নি নিঃশেষ,
প্রদীপ-শিখার রূপে দুঃখ-মূর্তি জাগে অনিমেষ।
প্রকাম-উন্মুক্ত তব আশ্রমের দ্বার-বাতায়ন,
তার মাঝে শান্ত তুমি মননের গহনে মগন।
দুঃসহ-সুন্দর-দুঃখ সুখ হয় যে সাধন-ফলে,
বিকাশে তৃতীয় নেত্র, অন্তরেতে স্যমন্তক জ্বলে,
রূপের সে অরবিন্দে, অরূপের মধু করি পান,
"দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছ সন্ধান" ;
গানে-গানে, সুরে-সুরে, রূপে-রূপে, ছন্দের ক্রন্দনে
অনন্তেরে আলিঙ্গিতে চাহিয়াছ বাহুর বন্ধনে।

হে প্রসন্ন-উদাসীন, কি দেখিছ সন্ধ্যার বাউল?
দীপ্ত জ্যোতি-উপবীতে আবর্তিছে গ্রহের বর্তুল
সুদূর নক্ষত্র-লোকে,—দেশ-কাল-ঋতু-সংবৎসর
মন্থন করিছে কোন অনাহত সপ্তকের স্বর।
'হিমাদ্রি'র মেরুদণ্ডে বিসর্পিত প্রতিধ্বনি তার,
স্তব্ধ ব্যোম, স্পন্দমান গায়ত্রীর আদিম ওঙ্কার।

ত্রিকূটে

বোধন-গীত, বেদের সাম
রটায় এক বিরাট নাম ;
বহায় তাঁর দয়ার স্রোত,
সকল লোক ওতপ্রোত।
ত্রিকূট-শির, অরণ্য
অরুণ রাগ-প্রসন্ন।

প্রভাত আজ বিলায় বন,
না রয় ভেদ আপন-পর।
আগল-হীন ঘরের দ্বার
ভাসায় সেই রসের ধার ;
শুনুক প্রাণ নীরব গীত,
গাইছে ওই আকাশ-মৃৎ।

পথিক-মন চলরে-চল,
ফলুক তোর ধ্যানের ফল।
রে রাত্রির যাত্রী আয়,
প্রণাম কর তাঁহার পায়,
জীবন-ভোর তপস্যায়
নিখিল জীব তাঁরেই চায়।

চেনায় কে ভ্রান্তকে
তার সে প্রাণ-কান্ত কে?
তপন-সোম, তাহার হার
সদাই জয় গাইছে তাঁর।
ভুবন-ময় আনন্দের
লহর বয় কী ছন্দের!

হউক ক্ষয় তমিস্রার,
আছেন সেই সারাৎসার।
নামিয়ে শোক-দুখের ভার,
পথিক চল অপার-পার।

হউক ছাই ব্যথার ধূপ,
জাগুক সেই অরূপ-রূপ,
লাগুক সেই আগুন-তাপ,
দহুক তোর গোপন পাপ।

বৈরিতায়, মিত্রতায়,
ইষ্টলাভ, ব্যর্থতায়,
চিত্ত রোক অচঞ্চল,
মিলবে তোর পূর্ণ বল।

নিসর্গের রঙ্গপট,
আসছে আর ফিরছে নট।
এ কর্মের কর্তা কে?
জানরে সেই আত্মাকে।

সুখ-দুখের এ হিন্দোল,
এই রোদন-হাস্য-রোল,
এই বিষাদ, এ উল্লাস,
এই যে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস,
তিরস্কার, পুরস্কার,
নয় তিলেক বদলাবার।
পূর্বেকার ঠিক করাই
ঘটছে সব ঘটবে তাই।

ভোগের লোভ, হাহা-কার,
রক্তপাত জন্যে যার,—
কিছুই নয় চিরস্থির,
আজ নবীন, কাল স্থবির,
সব অলীক, মূল্যহীন,
ফুরিয়ে তোর যায়রে দিন।

স্বপ্ন সব সত্য নয়,
নিত্য তোর মৃত্যু-ভয়।
হঠাৎ বাক হয় নীরব,
এই দেহই জ্যান্ত শব।

মায়ার বার, নিগড় ভাঙ,
বইছে ওই সুধার গাঙ।
নামের সুর স্মরণ কর,
স্মরণ কর নিরন্তর ;
মনন কর অচিন্ত্যের,
সে অব্যয়-অখণ্ডের
গুহায়-লীন মণির ভায়
ঋষির কণ্ঠ সে সুর গায়।

হউক প্রেম অকৈতব,
অমল হোক পূজাস্তব।
অনুত্তম বিরাট নাম
পূরাক সব মনস্কাম।

বাজাও শাঁখ, বাজাও শাঁখ,
মিশাও তায় প্রাণের ডাক।
কোথায় সেই সুদুর্লভ,
সে সুন্দর, সে ভৈরব,

শিবের রূপ, সে রুদ্র
তরান কাল-সমুদ্র?
নমস্তে হে অ-দ্বয়,
নমস্তে জ্যোতির্ময়।

রাই

সুন্দর তব তৃপ্তিব লাগি ফুটেছি যৌবনে,
গাঁথিয়াছি হার তব মনোহারি-পীরিত-রঙ্গনে
হে প্রাণ-বঁধুয়া মোর,
ভেঙনা তন্দ্রা-ঘোর,
আঁখি যে মজেছে কাজল-রূপের স্বপন-অঞ্জনে।

গানসম শুনি ননদীর গালি বাঁশরি-সঙ্কেতে,
পাগল-করা সে অভিসার-বেশে ওঠে গো মন মেতে।
গর্জন-জলধরে
প্রাণ যে কেমন করে,
(ওগো) কোন বনে বাজে কলবেণু তব, শুনি গো কান পেতে।

পা টিপিয়া চলি পিচ্ছিল-পথে, কী সন্তর্পণে,
তৃষিত অধর জুড়াবে কখন অমৃত চুম্বনে?
পলেক না দেখে হায়
হৃদয় ফাটিয়া যায়,
অশ্রুতে ভিজে এ নীলাম্বরী, গুমরি ক্রন্দনে।

কতোনা কেঁদেছি বুকে মাথা থুয়ে অদূর বিচ্ছেদে,
কাছে পেয়ে পাছে আবার কখন হারাই সেই খেদে।

এ যেন দুঃখ নয়,
ঢুকেছে লজ্জা-ভয়,—
জীবনের তারে দিয়েছ তোমার নামের সুর বেঁধে।

চির-যুগ ধরি বিহার করি গো ব্রজের ফুল-শেজে,
মধু-মন্তরে অন্তর-গাঁথা তোমারি সঙ্গে যে।
মুখ-পানে চেয়ে রই,
গাগরি ভরিল কই?
উজান যমুনা-সুর-তরঙ্গে ওঠে কি গান বেজে?

হে চিকন-কালা, টানে বনমালা, পবান চঞ্চলে,
কই প'ল তব চরণের ছাপ বিছানো অঞ্চলে?
চন্দন হল ক্ষয়,
না এলে হে রাধাময়—
নেহারি কান্ত অপাঙ্গে তব বিজুলি উজ্জ্বলে।

প্রবাসী

বনের পাখিরে ধরেযতনে আদর করে
রাখিলে খাঁচায়,
ডাকে বটে বারে-বার, প্রাণ-হীন সে ঝঙ্কার
বাজে বেসুরায়।
হাসি-স্বপ্ন ছুটে যায় টুটে কান্না, মুক্তি চায়
অশ্রুকণা তার ;
চায় পাখি নীল-গিরি সেথায় সে যাক ফিরি
সমুদ্রের ধার।
মন চায় খোলা হাওয়া, ঘর-মুখো ভেসে যাওয়া
ব্যাকুল পাখায় ;
সে কি খুঁজে পাবে আর আনন্দের বাসা তার
সবুজ শাখায়?
আকাশের ধারা-জল, রসে-ভরা মধুফল
ভোলেনি বেচারি,
নগরীর ধূলিরাশ বন্ধ করিয়াছে শ্বাস,
দাও ত্বরা ছাড়ি।
অধরের কাছে তার ধরোনা, ধরোনা আর

ব্যথার পেয়ালা,
আশায় দাদন দিয়া কাতরে সহিছে হিয়া
বন্ধনের জ্বালা।
সহিতে না পারে আর সোনার হাঁসুলি-ভার
চেপে ধরে গলা,
দা-রঙ্গী এ দুনিয়ায় মন যে মজেনা হায়,
কাঁদিছে উতলা।
দেয় স্মৃতি বড় দাগা, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা
হয়েছে সমান,
পেয়েছে—পেয়েছে টের অবসন্ন জীবনের
শেষ দিনমান।
আর কেন? আর নয়, পুরানো এ অভিনয়,
খুলে দাও দ্বার,
ডাকে সে অন্তিম ডাকে, ঝরে পিঞ্জরের ফাঁকে
রাঙা রক্ত-ধার।
ওই শোনো গায় আহা,— 'সত্য যাহা পুণ্য তাহা',
পূর্ণ কলস্বর,
উঠিছে উপর-পানে, পশে কানে প্রাণে-প্রাণে।
প্রেমই ঈশ্বর।

আবছায়ায়

জলের পারে ঝাউয়ের সারি
জ্যোৎস্নালোকে দেখায় কালো ;
অনেক দূরে পাহাড়-চূড়ে
রাতের কাজল হয় ঘোরালো।
আবছায়া সে বেড়ায় ঘুরে
ডাক দিয়ে যায় চেনা সুরে,
মুখের রেখা যায়না দেখা,—
চলার সাথী বাতি জ্বালো।
কে এল রে, কে গেল রে?
পালিয়ে গেল একলা ফেলে,—
পাথার-পুরীর দুয়ার খুলে
দাঁড়ায় সে কি প্রদীপ জ্বেলে?

সাঁতরে চলি ঝড়-ঝাপটে,
পথ চাহে সে সাগর-তটে,
বড় মধুর, বড় কোমল,
 ডাগর দুটি নয়ন মেলে
হা মুসাফির, আশার ফকির,
 ছটফটিয়ে মরিস ঘুরে
যায়না জানা সেই ঠিকানা,
 যথায় গেলে পিয়াস পূরে।
জেগে-কাঁদার রাত ফুরাবে,
চিতার জ্বালা জুড়িয়ে যাবে,
বদলে যাবে 'পূরিয়া' তান
 ভোরের ললিত-ভৈঁরো সুরে!

সাঁঝের সুরে

কুহু-স্বরের মিঠা জবাব দেয়রে উড়ো হবরোলায়,
সামনে দূরে সবুজ পাহাড় হারিয়ে উজ্জল রংটি তাহার
নীলবড়ি-খণ্ড ওড়না গায়ে দেখায় সুপথ দিগ্‌ভোলায়।

সম্মুখে কোন মনোহরণ অন্তরে মোর দেয়রে দোল,
কতো যুগের আকিঞ্চনে চিনেছি সেই প্রিয়জনে,
এই গোধূলির দো-আলোতে, ওরে দোদুল, ঘোমটা খোল।

ব্যাকুল করে বেলা-শেষে নেপথ্যে দূর-সুরের বেশ,
চলছি একা, ঝড়ের রাতি, বাজায় বাঁশি পাষাণ-সাথী,
মন্ত্র শুনি—"বনং বজ্রেৎ", কত দূরে প্রবাস শেষ?

গহন-মাঝে ঝরনাধারায়, "বনং ব্রজেৎ" প্রতিধ্বনি,
আকাশে নিঃশব্দ নীলে ব্যঞ্জনা তার বুঝিয়ে দিলে,—
'ভেবে দেখ কি পেয়েছ, কি দিয়াছে এই ধরণী।'

হঠাৎ যেন উঠলো নড়ে শৈল-তরুর উচ্চশির,
দেবতাদের সঙ্গে কথা বুঝি ওরা কইছে হোথা,
বুকের ভাঁজে দুঃখ বাজে, নয়ন-কোণে জমছে নীর।

যা শুনিনি, যা দেখিনি, ধরব ধ্যানে চক্ষু বুজে
হিমালয়ের নীরব গানে জাগবে বাণী বধির কানে,
তারার ভাতি হারিয়ে রাতি পালিয়ে যাবে আঁধার খুঁজে।

তলিয়ে ছিনু কূপের তলে, পাইনি খবর উপরকার,
স্বপ্ন দেখে খ্যাপা কবি আঁকছে অতীন্দ্রিয়ের ছবি,
অন্বেষিছে অন্ধকারেও দেখা পাওয়া যায় যাঁহার।

পরাস্ত আজ সবার কাছে, তাতেই আমি রই খুশি,
করনু বাজে জ্ঞানের বড়াই, সারাজীবন মানের লড়াই,
কাম-রূপে মোর দিলাম পূজা. বক্ষে ভোগী সাপ পুষি।

প্রশ্ন 'পর প্রশ্ন কেন? চাইছ মিছে কৈফিয়ত,
এই পৃথিবীর মাটির ঘরে ভরসা করি যাদের 'পরে,
তারাই মোরে দেখিয়ে দিল নির্জনে নিঃসঙ্গ পথ।

যাচেনি মন, পেলে যে ধন কান্নাহাসি রয়না আর,
আরশিতে মোর ময়লা যে ভাই, স্পষ্ট ছবি দেখছিনা তাই,
ভুলের গোলক-ধাঁধায় ঘুরে হারিয়েছি দ্বার বার বার হবার।

চিত্র-প্রদীপ-শিখায় গৃহ করতে চাহি সমুজ্জ্বল,
সাগর-তটে ঝিনুকগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ভরনু ঝুলি,
কিন্তু ছোট পাত্রে আমার মিলিল কই মুক্তা-ফল?

শান্তি-তরে বেড়াই ঘুরে গির্জা-দেউল-মসজিদে,
ভক্ত যেথা ভগবানে ডাকে সদা আর্তপ্রাণে,
প্রত্যুত্তর পায় যেখানে, সুধার ধারা বয় হৃদে।

বাহিব থেকে যায়না দেখা, আছেন 'চিকে'র মধ্যে কে,
আমা-সবে দেখেন তিনি, কেমন করে তাঁরে চিনি?
ডাক দিয়ে যায় অনুক্ত বাক্—'পথের বোঝা আয় রেখে।'

আত্মারে মোর দুঃখ দেবে এমন কোন বস্তু নাই,
এই কথাটি সঙ্গোপনে বুঝব কবে মনে-মনে?
সত্য মেলে কি করি? দুঃখ হতে মুক্তি চাই।

ক্ষ্যাপার গান

সোনার থালা গিনির মালা ভালোবাসার ভান,
অভিনয়ের উৎপাতে হায় বিষিয়ে গেছে প্রাণ।
শয়তানেরি জয়-তানেরি কোরস-সুরে বাজিয়ে ভেরি
বন্ধু-মুখের মুখোশ পরি শত্রু হানে বাণ।

মদন-পূজার পাত্র ভরি ফেনিল মহুয়ায়
করছে দেখ খুনোখুনি রাঙিয়ে দুনিয়ায়।
রূপের রঙিন মাকাল ফলে মুনির মানস নেশায় টলে,
কাব্যে তাহা মিথ্যা কথা প্রেমের কল্পনায়।

আরশিতে মুখ দেখাদেখি, বুদ্ধি পাটোয়ারি,
স্বার্থ শানায় গুপ্তি-ফলক, যাই গো বলিহারি।

বাইরে চিকন ভিতর ভূয়া   আশায় পাশায় খেলছে জুয়া
বিনয়-ঢাকা অহঙ্কারে মত্ত নরনারী।

ধর্ম, সে তো দুর্বলতা—হাঁকে নাদির শাহ,
জোর-জুলুমে লও গো কাড়ি যে ধন তুমি চাহ।
চায় রমণী বীরের পাণি   এইটুকু সার সত্য মানি
যৌবনেরি পাগলা আগুন করুক গৃহ-দাহ।

বহুত আচ্ছা শাবাশ-শাবাশ, রটবে তোমার নাম।
কোমলতায় খেদিয়ে দূরে বাজাও আপন কাম।
ত্যাগের চেয়ে ভোগ সে ভালো,   ঢালো সাকী সরাব ঢালো,
গেয়ে গেছেন অমর কবি 'ওমর খৈয়াম'।

পুণ্য-পাপের শূন্য দাবি, ফাঁকা আওয়াজ তার।
অরণ্যে হায় রোদন মিছে ব্যর্থ হাহাকার।
কতোই দুখী আতুরজনা   ফেলে চোখের জলের কণা
কি যায়-আসে? কাঁদে হাসে দুনিয়া চমৎকার।

তোমরা শেষে বক্র হেসে করলে প্রবঞ্চনা।
প্রতিদানে পেলাম শুধু দুর্দশা-লাঞ্ছনা।
ঘরে-বাইরে দুঃশাসন,   বাধায় কুরুক্ষেত্র রণ,
ফুঁসছে বুকে কেউটে সাপের প্রতিশোধের ফণা!

ভেকের মতো মুখ লুকাবে শকুনিদের দল,
চোরা-বালির চরে তাদের থামবে কোলাহল।
বৃদ্ধ বটের কোটর-বাসী   জরদ্গবের গলায় ফাঁসি
লাগিয়ে দিয়ে দাও টাঙিয়ে বেঁচে কি তার ফল?

বেরিয়েছে মন কালাপাহাড়, চালায় হাতিয়ার,
পণ করেছে ভণ্ডামি সব করবে সে চুরমার।
ভাবছে যারা কপাল-দোষে   ক্ষয়-জ্বরে হায় শোণিত শোষে
মৃত্যু তাদের শাস্তি নহে শান্তি-পুরস্কার।

দুঃসময়ে দেখবেনা কেউ, খবর আসিয়াছে।
জ্বালিয়ে রাখ নিজের চিতা, রবেননা কেউ কাছে।
চোখ রাঙাবেন প্রাণেশ্বরী,   পুত্র যাবেন দূরে সরি
হিসাব নেবেন আড়াল থেকে ব্যাঙ্কে কত আছে।

সাতটি সুরের একটি চেনা, অই রুপিয়ার সুর,
বাজে প্রাণের কানের মাঝে সুধায় সুমধুর।
অনেক ভুগে অনেক ঠেকে বেরোয় কথা মর্ম থেকে
সোনামণি নইলে পরে জীবন না-মঞ্জুর।

করে বেশি মেশামেশি নেবেন কেহ ধার।
কর্জ দিলে যেরূপ ঘটে ঘটবে সে ব্যাপার।
বিনা দোষে জরিমানা কেন দেবে? করি মানা,
শুনবে কেবল দেহি-দেহি, বলব কতো আর।

যেদিক পানে চাইবে ফিরে, এই দুনিয়ার ভাও।
পাগলা বলে লাগাও কোড়া তুড়ুম ঠুকে দাও।
কাঁপবে সবাই তোমার ভয়ে, বোবার প্রলাপ মিথ্যা নহে,
খিটিমিটি ছাড়া হেথায় নেই বনিবনাও।

জীবন-ভরা বিড়ম্বনা, ভূতের নাচন নাচা।
বিগড়ে গেছে মাথার মগজ, ভেঙেছি তাই খাঁচা।
কুটিলতায় ভরা সমাজ, হাসিমুখে গালিগালাজ,
ইশারা মোর বুঝবেনা সে বুদ্ধিটি যার কাঁচা।

রসাতলে যাচ্ছি মোরা, নেইকো দেরি আর।
সাগর-জলে হাঙর চলে, হেরি দাঁতের ধার।
ইঁদুর যেন কলে পড়ে কাটা পায়ে রক্ত ছোঁড়ে,
সত্যহারা, শক্তিহারা হও গো হুঁশিয়ার।

নেইকো আমার কোন নালিশ, ঝগড়া বা মিটমাট।
সওদা ফেলে এলাম চলে চুকিয়ে মেকির হাট।
গভীর খেদে মরিয়া হয়ে বেদের মতো তাঁবু বয়ে
বেড়াই ঘুরে, কতো দূরে মিলবে খেয়াঘাট।

আমার মতো অনেক আছে দরদ-জ্বালা পায়।
ভবঘুরে কোথাও যাদের ঘর মেলেনি হায়।
ডাক দিয়েছে কর্মনাশা, টুটলো গুমর উঠল বাসা,
মর্ত্যভূমির কুম্ভ-মেলায় সন্ন্যাসী গান গায়।

মরীচিকা

হয়তো ভালো বাসতে পারে কেউ কাহাকে কভু
সঙ্গটুকু লাগে মিঠা, মনের কথা কয় কি কেহ তবু?
যখন কেহ মনটি কাড়ে, তার লাগিয়া রাজ্য ছাড়ে,
অদেয় তো রয়না কিছু আর,
সে যেন গো জন্মান্তরে হারানিধি তার।

অনুরাগের নিমন্ত্রণে মালা-বদল মনে-মনে,
তারে ছাড়া কিছুই নাহি চায়,
মৃগমদের অধিক মাতায় মৃদু হাসি শরম রাঙিমায়।
কহে, "ওগো, সেই তুমি কি? কই চাহনি, চির-প্রিয়, একান্ত আপন?"

কুসুম-ধনু করেছ কি বন্দি করে চখা-চখী?
মিলিয়ে হৃদয়, তালে-তালে গায় দু-জনে সেই পুরানো গান।
মাতোয়ারা প্রাণ।
প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে যথেষ্ট সে পরিচয়ের শেষে
জোয়ার-ভাঁটার যোগাযোগে, বার-দরিয়ায় কে কোথা যায় ভেসে।

হোলির ফাগে আগুন লাগে,
গিলটি ছুটে, ধরা পড়ে মেকি,
টোপের মাঝে বঁড়শি বাজে একি!
পাহারা দেয় ছদ্মবেশে, কি জানি কোন দোষে
পস্তায় আফসোসে।
আরশিখানি হারায় পারা, মুখ দেখা কি যায়?
কে-বা কারে চায়!
যার দরদে সইত, মরি, নিজের বেদনা,
পরের চেয়েও পর হয়ে যায়, কেমন সে-জনা!
লাগত ফাঁকা এই দুনিয়া তিলেক বিচ্ছেদে,
কি কুক্ষণে কাটা-ছেঁড়া হয় গভীর খেদে।
নিমের রাঙা পাতার চেয়ে তিক্ত লাগে তরুণ ওষ্ঠাধর,
সুন্দরকে লাগে অসুন্দর!
অনেক সখা, অনেক সখী ; আছেন অবিস্মৃত,
রাতের কালো ঘোমটা-ফাঁকে তাকিয়ে আছে মৃত্যু জীবন্মৃত।
কাল যাহারা দুঃখ পাবে আজ তাহারা হাসে,
প্রেম-পেয়ালায় জহর-গেলায় অনেক ঝামেলা সে!

সঙ্কল্প

স্বার্থ-অসির ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখে-সুখে টলবনা,
তোবামোদের নিশান হাতে আপনাবে আর ছলবনা।
স-পৌরুষে দলব পদে পরাজয়ের কল্পনা,
মঠে-মঠে লুটিয়ে মাথা নয়ন-জলে গলবনা।
বিবেক-বারণ শুনব শুধু গুরুর নিষেধ মানবনা।
জীবন্মৃতের মন্ত্রে ভুলে কে বলে আর আনমনা।

সত্য-ন্যায়ের শাস্ত্র ছাড়া অন্য বিধান জানবনা।
আকাশ-কুসুম লক্ষ্য করে বাণের ফলা হানবনা।
অভিমানীব সোনার প্রদীপ পূজার ঘরে জ্বালবনা।
রজস্তম ধূপ-ধুনা-ছাই-কাজল-কালি ঢালবনা।
বলের সেরা ধ্যানেব বলে অকুতোভয় দৃক্‌পাতে।
ভরব আমার ধর্মশালা অমৃত-বস-ভিক্ষাতে।

বুড্ডু-মা*

(১)
আমি বড় ভালোবাসি
বুড্ডু মায়ের মৃদু হাসি,
মায়ি বলে ডাকলে তারে
দেয় সে চুমা মোরে।
ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের 'পরে
বুড়ো ছেলের দাড়ি ধরে,
হাত ঘুরায়ে চুল উড়ায়ে
কেমন আদর করে।
সে যেন জুঁই ফুলের রাশি,—
আর জনমে ছিল মাসী,
এই জনমে মা হয়ে গো
ঘরটি আলো করে।
ঠোঁটের রাঙা লজঞ্চুসে
মধুটুকুন লই গো চুষে,—
তারি লাগি হৃদয়-গলা
আশিসধারা ঝরে।
ভালে তাহার টিপ পরালে
দেখায় সে তার মার কপালে
আঙুল দিয়ে এ কী বুদ্ধি
বয়স দুবছরে।
মানুষ হাসে পুণ্যফলে
হাসে সে "বিজয়া"র কোলে
মুখে গো তার সোনার ঝিনুক

---

* আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসন্স জাজ, হুগলি) পৌত্রী শ্রীমতী ব্রততী দেবীর প্রতি আশী ্বাদী।

ভরা দুখের সবে।
ইচ্ছা যাঁহার জাগলে পরে
কাঠের বিড়াল ইঁদুর ধরে
ভালো হলেই বাসেন ভালো
দেখেন বিচার করে।
পেরেছি মা চিনতে তোমায়
এই পবিচয় তাঁর করুণায়
আছেন তিনি সবার প্রাণে
আছেন চরাচরে।
আমি বড় ভালোবাসি
বুড়ু মায়ের কচি হাসি
মায়ি বলে ডাক্‌লে তাবে,
দেয় সে সাড়া মোরে।
ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলেব 'পরে
বুড়ো ছেলেরে দাড়ি ধরে
চুল উডায়ে হাত ঘুরায়ে
কেমন আদর করে।
সে যেন জুঁই ফুলের রাশি—
আর জনমে ছিল মাসী
এ জনমে মা হয়ে সে
এল মোদের ঘরে।
ঠোঁটের রাঙা লজ্জুসে
মধুটুকুন লই গো চুষে
তারি লাগি হৃদয় থেকে
আশিসধারা ঝরে।

মনুয়া

সোনার দোলন চাঁপার কুঁড়ি, কি লাবণি অঙ্গরাগে,
ওরে আমার খেলার পরী, তোর দোলনে দেবতা জাগে।
বল দিকিনি কোন জনমে তুই ছিলি কার আপনজন,
তেমনিতরই মধুর লাগে তোর নূপুরের গুঞ্জরণ।
পড়ছে মনে কুঞ্জবনে তুই ছিলি কার রাইকিশোরী,
যুগে যুগে বারণমালা পরাস তারে লো সুন্দরী,

কাঁদিতে তোর ইচ্ছা করে কিসের দরদ পদ্মমুখী?
তোর লাগি মন কেমন করে, কেউ কি আছে সর্বসুখী?
যার স্মৃতি তুই, যার প্রতিমা, ভুলবে কে সেই মা লক্ষ্মীরে
ভালো তারে ভোলাই ভালো—যে গিয়েছে মর্ম ছিঁড়ে।
দুলালীরে স্তন্যদানের পুণ্য সুখে বঞ্চিতা
প্রিয়জনে চোখের জলে ভাসিয়েছে যেই বাঞ্ছিতা,
সাজানো ঘর শূন্য করে এমনি আহা হয় যেতে।
এমন দাগা কারো যেন না নিতে হয় বুক পেতে।
স্বর্গে-মর্ত্যে যোগ আছে গো সেকি আসে অনেক রাতে?
জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এলে বসে সে তোর বিছানাতে?
ডুকরে ওঠে পোষা টিয়ে, দেখতে বুঝি পায়রে তায়
সেও কি কাঁদে মোদের মতন, ছায়া মিলায় অবছায়ায়
কথা গেঁথে যায় কি বলা সবচে বড় বেদনাটি?
সে কি তোরে কোলে করে মাখিস যখন ধুলামাটি?
উচিত কি তার এমনি করে লাগিয়ে আগুন পালিয়ে যাওয়া?
আলতারাঙা বেশে চুকিয়ে দিয়ে দাবি-দাওয়া?
ছবি যদি মোদের মতোই কইতো কথা নয়ন মেলে
ভালোবাসার সাজা দিতে মানুষ লুকোচুরি খেলে।
মন নাড়া দিসরে মনুয়া, খাবার এনে বললি দাদু
লও খেয়ে লও, খাইনি আমি গলার সুরে করলি জাদু।
তোরে হেরে এই উদাসী পারের পথিক বলবে কি?
তোর চোখে রাজ-রাজেশ্বরী সর্বজয়ার চোখ দেখি ।

[লেখা ও রেখা, বৈশাখ, ১৩৬৫]

রাণু

মোদের মুখের ছোট্ট ফটো
হেরি যে তোর চোখের ক্যামেরায়।
চেয়ে-চেয়ে তুহার পানে
পদ্মকুঁড়ি ফুটতে ভুলে যায়।
স্বপ্নপুরীর আকাশ দেখে
হেসে-হেসে করিস রে দেয়ালা
অমিয় রস বিলায় তোরে
মায়ের স্নেহ ননীর সে পেয়ালা।

দোলায় শুয়ে চাস ধরিতে,
শোলার ঝাড়ায় দোদুল সে চাঁদখানি।
লুকোচুরি খেলার ঘরে
পরীর খুকি দেয় বুঝি হাতছানি।
ঝরিয়ে দিয়ে বকুলগুলি
কাঁপিয়ে পাখা শেখায় কি নাচনী
মুঠি খুলে চুষিকাঠি
দিতে তারে ডাকিস রে বাছনি?

দিনে স্বপন দেখার মতো
দেখেছিলাম বছরখানিক আগে
আজ কি তোরে চিনতে পারি
স্মৃতিটুকু বড় মধুর লাগে।
কতো বড় হলি এখন?
হামাগুড়ি দিস কি গরবিনী
মানুষ চিনে কাছে আসিস
হবি কি মোর কবিতা-সঙ্গিনী।

বাজে কোথায়? মহাবাঁশি
নয়ন বুজে শুনিস বুঝি রাণু
সুবলবেশে ধেনু নিয়ে
দেখতে যেতিস নওলকিশোর কানু
সরলতায় মুখখানি ঠিক
ফুটিয়ে দিল যে তোর চাঁদমুখে
স্মরি তাঁহার কারুপনা,
এসেছি আজ তোরে কোলে নিতে।

[শ্রীমান কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাতনীর প্রতি]

ডাক

পান্থ-পাদপ বল্কলেতে কুঠার হানিয়ে,
মরুবাসী মিটায় তৃষা, মধুর পানীয়ে।
তেমনিতর কে তুমি এই মর্ম-চিরিয়ে,
নতুন কাঁদন কাঁদাও নিতি চাওনা ফিরিয়ে।

এমন দাগা দাও গো কেন? নিঠুর-পীড়নে,
এই কি তোমার দয়ার বিধান শাসন-তাড়নে।
কিছুই কেন ঘৃণাক্ষরে না দাও বুঝিতে,
পথ হারায়ে ঘুরে মরি তোমায় খুঁজিতে।
সয়না জ্বালা আগুন খেলা দাও গো ঢেলে জল
দাও নিভায়ে আঁধার করা চিতায় ধূমানল
সুন্দর এই পৃথিবীতে মানুষ কেন কাঁদে?
ভালোবেসে মধুর হেসে পড়ে মোহন ফাঁদে।

কোনো কাজই নেইরে আজি নেই কোন তাড়া
চোখ বুজিলেই দেখছে বেশি এ শান্তিহারা
ছড়িয়ে যেতে হবে সবই তৃপ্তি চাহিলে
দুঃখ তোমার বেড়েই যাবে বেদন গাহিলে।

রাতের সুরে অনেক দূরে যাত্রা করাবে
পরমপথে পদে-পদে নয়ন ঝরাবে
শূন্য মরীচিকার মায়া জলের লহরে।
ভ্রান্ত কেন ঝুটা থেকে তফাত রই রে।

দেউল-শিবের লোহার ত্রিশূল কষাই ছুরিকায়
জানি তোমার পরশমণি সোনা করেই যায়।

আবাহন

দেবী।
অলির পাখার চরণ-নূপুর গুঞ্জরি,
কুসুমকুঞ্জ কেশ সৌরভে মুঞ্জরি
আমার রূপসী, আমার মানসী,
একবার আজি এস গো!
মাথা থুয়ে আজি তোমারি রাতুল চরণে,
এই দীনহীন মোহিবে মোহন মরণে,
সার্থক হবে মানব-হৃদয় হরণে,
এস গো, তরুণী এস গো।
কনকাঞ্চলে অমৃত ঊর্মি আন্দোলি,
এস গো, মোহিনী নামিয়া।
কবে কোন দিন মধু পূর্ণিমা-নিশীথে
হবে দু-জনায় নব-জ্যোৎস্নায় মিশিতে!
গর্জন-গুরু বুক-দুরুদুরু
সহসা যাইবে থামিয়া!
আজি, এস গো শোভনে নামিয়া।

পাগলের গান

ওগো সেকি মোর হবেনা
আমার কুসুম সুরভি কি তার
বেণীবন্ধনে রবেনা।
হাতের নোয়ায় সিঁথির সিন্দূরে
সোহাগে-সাদরে-সরসে-মধুরে
সেকি পূজিবেনা পরান বঁধুরে সাধিয়া
ব্যাকুল বক্ষ বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া।

পাগল করেছে কাজল নয়ন
অশ্রু আলোকে ভরিয়া
কিছু যে বোঝেনা! অকুণ্ঠিতায়
বুঝাব বলো কি করিয়া?
যার গৌরবে গর্ব আমার
যার অধিকারে মোর অধিকার
মরণ-বাঁচন শুভাশুভ যার আমার সাথে
তাহারে সঁপিবে আজিকে বন্ধু কাহার হাতে?

আজিকে রজনী বজ্র-উজ্জ্বল
লুপ্ত জ্যোৎস্না-তারকা
দিগ্‌দিগন্তে গর্জে ঝঞ্ঝা
পুষ্পউজল করকা
আজ বাঁশিহীন যমুনার তীর
নাচিছে লহরি মত্ত-মদির।
পাগল পবান বেদনা-অধীর গৃহের কোণে
আজিকে রুপসী, মোহন মিলন তোমার সনে।

আজ চলে এস ত্বরা ছুটে এস দুয়ার খুলে
চঞ্চল চোখে সিক্ত বসনে সিক্ত চুলে
আজিকে সুখের নাহিরে অন্ত
আজিকে দুখের নাহিরে অন্ত
চরম সৌম্য পরমানন্দ আঁখির কূলে
মিশেছে আজিকে স্বপনে-সত্যে মরমে-ভুলে।

আয় ছিঁড়ে আয় কুলবন্ধন
পিছে পড়ে থাক মিছে ক্রন্দন
হাসুক উষার কনক কেতন গগনমূলে।
গঙ্গা আজিকে উদার-গভীর ফেনায় ভরা
এসেছে তুফান নিখিলের প্রাণ পাগলকরা
এস এইখানে তুমি আর আমি
বসি দু-জনায় ডাকি জলে নামি
মেঘের ছায়ায় শীতল সলিলে সাঁতার কাটি
খুঁজি দু-জনায় পরশ পাথর সোনার বাটি।

আজি এস তুমি নিখিল সুষমা অঞ্চলতলে লুকায়ে
প্রবাহিয়া এস নিখিলের আঁখি শুকায়ে

বাজুক কাঁকন সোনার নূপুর,
নাচুক মেখলা কনক-মুকুর
বিম্বিত হোক মেঘের আড়ালে
কিরীট কিরণ মাখি
ঝলসিয়া যাক জগৎজনের
আর্ত-অন্ধ আঁখি।
ইহজন্মের-পরজন্মের তুমি বাঞ্ছিততমে
তুমি অন্তরে কল্পব্যাপিনী অয়ি অন্তররমে
প্রণয়ে-কলহে তিমিরে-কিরণে
মিলনে-বিরহে জনমে-মরণে
তুমি মোর ধ্রুব হে নিরাভরণে হে নিরুপমে
ভুবনে-ভুবনে বাজায়ে বীণ
ভ্রমিব দু-জনে রজনী-দিন
শুধিব তোমার প্রেমের ঋণ
যতনে-সাদরে এ দীনহীন নূতন প্রেমে
হে প্রিয়তমে
হে নিরুপমে।

চল্ ছুটে চল্

ওরে ক্ষিপ্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে মহাবল
আছে অপার্থিব নিধি। জটিল সংসার
করেছে-করেছে বটে তোরে ভ্রষ্টাচার—
কিন্তু আজ যে আগুন জ্বলিয়াছে চিতে
শ্যামিকা পোড়ায়ে দেবে নিমেষ না যেতে।

আসে আলো ভাসে আলো—এ পরম ক্ষণ
কে জানে পলকে যদি হয় অদর্শন
রাখ যত্নে এ স্ফুলিঙ্গ—অন্ধ অন্তঃপুর
পবিত্র-বিশুদ্ধ কর—ডাকিছে সুদূর
মস্তিষ্ক বিগড়ি গেছে সংসারী-হিসাবে
যাক তাহে ক্ষতি নাই—অসংসার ভাবে
ভরে নে মনের পাত্র—করহ কীর্তন
ক্রিয়াপদহীন স্তবে পূর্ণ আবাহন।
মঙ্গল বাড়ির দ্বার খুলেছে যখন

কর ভোগ হরিনামে রে অবোধ মন।
পাইয়াছে যেই সুধা দিব্য মহাজন।
ভুঞ্জ সে মনের ভাব কর তারে ধ্যান
সহজে ধরিতে যারে নারে নরজ্ঞান
বার্তা যার বিশ্বজুড়ে
বার্তা যার অন্তঃপুরে
যেখানে আঘাত দিলে বেজে ওঠে মন
সুখ-সার শান্তি-সার, সার প্রেমধন
যার রসে পুষ্ট নাড়ি—বহিছে জীবন
বহু পুণ্যে এসেছে এ মঙ্গল-প্রসাদ
আলিঙ্গিয়া ধর তারে মিটিবে গো সাধ
বিশ্বে যাহা মধুমাখা মধুচক্র এক
তার পানে রে সংসারী আঁখি মেলি দেখ
শান্ত হবে শ্রান্ত বুক—ভালো-মন্দ সব
একাকার হয়ে যাবে মিত্রতা-শাত্রব
ছোট-বড় গণ্ডি ভেঙে ছুটায়ে স্বপন
রেণু কণিকার প্রেমে করহ পোষণ
অন্যকৃত অপরাধ ক্ষমা যদি কর
তবে ক্ষমা লভিবারে হবে যোগ্যতর।

লোকের অবজ্ঞা? তায় কিবা আসে-যায়
আপনারে পূত কর মধুর ক্ষমায়
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তুই গেলিই বা মরে!
মনুর সন্তান হায় জন্ম-জন্মান্তরে
পাবে তোর জীবনের পুণ্য হুতাশন
বিশ্ব-হিতে তোর স্মৃতি হবে নিরঞ্জন।

মুক্তি

নীলিমার পানে চেয়ে আজ মনে হয়
মুক্তির সংবাদ—মুক্তি এই চিন্তা হতে—
দুঃখ হতে অব্যাহতি আছে গো কোথায়
ওই অনন্তের কোলে তারার জগতে।
চেয়ে-চেয়ে-চেয়ে ওই সুদূরের পানে
নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি—দেই ছেড়ে-ছুড়ে

এই তিক্ত সুখ—আছে, আছে, ওইখানে
এর চেয়ে স্বাদু সুখ জ্যোতির্লোক জুড়ে—
যার ধ্যানে মত্ত হয়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে, হায়
ছুটিয়াছে মহাজনে আনন্দে-আশায়।

যতদিন বিরাজিবে মানব-হৃদয়
যতদিন রবে আশা-লালসা ও ভয়·
হেন দুঃখভারে বহি অহোরাত্র সহি
তিতিবে অশ্রুর উৎসে জীবধাত্রীমহী।

জীবনের বেলাটুকু আসে যত পড়ে
হে দেবতা একি সত্য শিখাইছ মোরে
আপনারে নির্বাসিয়া সত্য শোভা হতে
কপটেব ছদ্মবেশে হবে এড়াইতে
সংসারের কাঁটাখোঁচা দিতে হবে বলি
প্রেম-ধর্ম, মনুষ্যত্ব—যন্ত্রণায় জ্বলি
ছি-ছি মন, ছেড়ে আয়—আছে দিব্য সুখ
কি করিস ভেবে দেখ্—অশ্রু মুছে ফেলে
দেখ্ দেখি অনন্তের দিকে চক্ষু মেলে
আসে ওরা বাধা দিতে? গৃহে ফিরাইতে
টানে তোর বাহু ধরে দুঃখে ডুবাইতে
দেখাইয়া দে তাদের অঙ্গুলি প্রসারি
সুদূর উহার নাম অনুতপ্ত চোখে
কদিন লুটাবি হায় এ নেশার ঝোঁকে
নিদ্রাহীন শয্যাতলে ওরা প্রতিবাসী
ওদের কি?

এস ভক্ত এস অবিনাশী
এই কারাগার-তলে মোহের অঞ্জন
মুছে ফেলে দুইহাতে—বিগত জীবন
বহু সাধনার ফলে হয়েছে শোধন
মনোমণি—এ মণিতে মাখায়োনা আর
এ দুনিয়ার পঙ্ক—যাবে লুপ্ত হয়ে
পেয়েছে যে পুরস্কার শত জন্ম সয়ে।
আছে দান অনবদ্য পাবন অক্ষয়
নিত্য নিষ্কলুষ নিত্য পবিত্রতাময়
সংস্কার সংযম দম্ভ।

পদ্মা-তটে

সোনার ঝলকে শরতের দিনে
শরীর ডুবায়ে ঘনশ্যাম তৃণে,
ধরণীর স্নেহ করের পরশ
জীবনে আমার বুলায় হরষ
ঝাউয়ের ঝালর ঢুলায়ে।
হেরি চেয়ে-চেয়ে পদ্মার পার—
তট-গুণ্ঠন তরু সারে-সার
চিরুনির মত লালায়িত শির,
সন্ধ্যায় শ্যাম তাল বনানীর—
দিগে ধায় খগ কুলায়ে।

সোনালি-সবুজ গাঙ্ ভরা জল,
একূল-ওকূল করে ঝলমল,
মেঘরথে করে করো আনাগোনা
দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়না—
ভাঁজে-ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে।

আজি জাগে ছায়া চুকানো সুখের
আজি জাগে মায়া লুকানো মুখের
পেয়ে হারায়েছি ধরিবার মন
প্রাণের ভিতরে না ছিল তখন—
আছি আজ দিঠি বাড়ায়ে।

গাছ ও মালী

গাছ বলে, মালী ভাই কেন ছাঁট মোরে?
কঠিন কাঁচির চাপে দাও ছোট করে?
মালী কহে—ওরে ক্ষেপা না সহিলে ক্লেশ,
যশের কুসুমে তোর ভরিবে কি দেশ?

বর্ষ-মঙ্গল

নবীন বরষ, নবীন উষায়
উদয় দেবতারে,
বরণ কর নবীন সুরে
জীবন-বীণার তারে।
নবীন মউল ফুটল আজি
দেউল-উপবনে,
অরুণ রূপের আলোব বাণে
মন্ত্র জাগরণে।
আশা-নদীব দু-কূলভরা
নবীণ পলি-মাটি,
বোনো নবীন সোনার ফসল
বাঁধ সুখের আঁটি।
স্বর্গ-প্রজাপতির সম
ইন্দ্রধনু-আঁকা,
নবীন বরষ ছড়িয়ে দেছে
পরাগ-মাখা পাখা।
লুকিয়ে ছিল যে কল্পনা
ঝরা-ফোটার গীতে,
উথলে উঠে মনের ঢেউয়ে
রসের লহরিতে।
প্রদীপ জ্বালি আসন পাতি
শঙ্খ ভরি, নীরে,
ভাসাও তরী আরাধনার
অকূল সাগর-তীরে।
প্রাণের ঘরে অগোচরে
আছে যা নির্মল,
ফুলের মতো আলোর পানে
মেলি হাজার-দল।
আকাশ যারে গোপন করে
সাগর-কলোচ্ছ্বাসে,
যায়না জানা যার সীমানা
বিকশি-পরকাশে,
মন-মৃণালে হরষ-রমার
চরণ-লীলাভরে,

কে ফুটাল পূজার কলি
ধ্যানের সরোবরে।
ফিরিবনা আর খেলার ঘরে
ধুলার বোঝা বয়ে,
টুটবে প্রাণের ঘোমটা-ছায়া
সকলহারা হয়ে।
উঠ গো মোর দিনমণি
ধ্যানের মোহানায়,
কিরণ ঢালো অমা-রাত্তির
তিমির কিনারায়।

পথের সুর

ডাকে দূর গহন দীর্ঘ পথ
দ্বারে দাঁড়িয়ে ওই যাত্রারথ,
যত মিথ্যে-সুখ, মিথ্যে-দুখ
চক্রে তার গুঁড়িয়ে দে।
হেথা কাউকে তোর নেইকো ভয়,
পথে দ্যাখ নতুন সূর্যোদয়,
সবে ধরবি হাত, চলবি সাথ,
জয়নিশান উড়িয়ে রে।
হাসে সামনে তোর গৌরী মা,
মবি, নেইকো তাঁর শ্রীর সীমা,
ঝরে মার স্নেহের দূর্বা-ধান,
লুটিয়ে শির, কুড়িয়ে নে।
তোরা করবি লাভ দৈব বর
যার স্পর্শে নর হয় অমর,
ওরে মৃত্যুজিৎ পুত্র তুই
শান্তিজল ছড়িয়ে দে।
এক শ্রেষ্ঠ সাম সত্য-ধন
ধ্রুব মন্ত্রবীজ কর গ্রহণ,
জানি ফলবে তোর তীর্থফল
মুক্তিস্নান গৌরবে।
জাগে যুগ-যুগের মাঙ্গলিক

মহা দীক্ষাগীত দিগ্‌বিদিক,
পাবি দৈবতের যজ্ঞভোগ
আত্ম-ধূপ -সৌরভে।
নিতি দিচ্ছে ডাক -হিম-গিরির
ওই শুভ্র কেশ তুঙ্গ-শির .
গাহে নীল গভীর সিন্ধুনীর
"কর বরণ সৎ শ্রেয়ঃ।
ওরে মন-কমল কর অমল
হোক যোগ জীবন পূর্ণ বল,
আজি অর্পি চল, কর্মফল
তুই নিখিল -মৈত্রেয়।"

হোলি

আজি বৃন্দাবনী ফাগুয়া বাগে রাঙিল পরান,
দোলে বকুল-বনে তমাল-স্বপনে হোলির নিশান।
বাজে মোহন মুরলী রস-লহরি অমিয়া তুফান ;
মরি কোয়েলা কুহরে, তনুয়া শিহরে, আকুল নয়ান।
ডাকে বন-বিহারী— বঁধু তুহারি মিছে অভিমান!
জাগে পূজার বেলা, বরণের মালা অর্ঘ্য কর দান
পাবে পরশ-মণি হরষ-ধ্বনি— হওরে আগুয়ান,
ডাক সেই লীলাময়ে না হইতে তব বেলা অবসান।

আগমনী

এস মা শক্তি, এস মা সিংহ-বাহিনী,
ভো মহাবিদ্যা, অভয়া মুক্তিদায়িনী,
এস মা গৌরী সারদা,
ভুবনেশ্বরী বরদা।
জয় শঙ্করী, খর-খর্পর-ধারিণী,
নমস্তে মাতঃ অয়ি সঙ্কট-হারিণী,
চাহ মা ত্রিলোক-জয়িনী—
জয় মহাকাল-মোহিনী।

সপ্ত-সাগরে কনক-কুম্ভে ভরিয়া,
শ্বেত-বারণেরা বারি ঢালে ঝর্-ঝরিয়া
তব অভিষেক-লীলাতে,
পুণ্য-বোধন-বেলাতে।
নন্দিত ওই নব আগমনী-তোরণে
জয়-জয়ন্তী গাহিছে নবীন চারণে,—
একি সুর বাজে পরানে,
আকাশ-পাতাল-তুফানে।
এস মা চণ্ডী-মণ্ডপ-তলে এস মা,
'নব-পত্রিকা'-পুষ্পলতিকা-সুষমা
অপরাজিতার কেশরে,
শিশির-মোতির বেশরে।
গৌড়ের এই প্রাচীন পঞ্চবটীতে
নবীন গোষ্ঠী জীয়ায়ে জীয়ন-কাঠিতে
দাও মা দীক্ষা 'মাভৈঃ'।
হারা-নিধি ফিরে পাবই।
এস কল্যাণী, গাঙ-ধারার দু-কূলে,
রাখ মা চরণ চিত্রোৎপল-মুকুলে,
শরৎ মেঘের ছন্দে,
আরতির তুরী-মন্দ্রে।
সাজায়ে মা তোর পলি-মাটি-গড়া প্রতিমা
কি মন্ত্রে তায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি মা,—
সে তন্ত্র-বেদে অধিকার
'বাহান্ন-পীঠে' আছে কার?
মহাষ্টমীর হোম-টিকা পরি একদা
সিদ্ধ পুরুষ—কোথা সে শাক্ত পুরোধা?
কই সে আহুতি-বলিদান
রক্ত-তিলকে গরীয়ান?
সন্ধি-পূজার তোপের ডঙ্কা ছুটেছে,
অতল পরশে ওঙ্কার-ধ্বনি উঠেছে,—
সাগর-গর্ভ জ্বলেছে,
অনন্ত ফণা টলেছে।
বাজায় ডমরু যুগ-তীর্থের বারতা
কুম্ভ-মেলায় ছুটেছে ভক্ত-জনতা
ভণ্ড-ভীরুতা দলিয়া,
সত্য-শরণে চলিয়া।

তব করুণার রক্ষা-কবচ পরিয়া,
পরমা শান্তি আনিব বরণ করিয়া,
পিইব মরতে অমৃত,
নাশিব অ-শিব অনৃত।
নাশিব অসুরে বিঁধি পাশুপাত সায়কে,
রথে তুলে নেবে তোমার পতাকা-বাহকে
তরুণ অরুণ সারথি—
রচিবে প্রভাত-ভারতী।
অশনি-আঘাতে নহে নত-শির যাহারা,
পাবে, কবে পাবে বাঞ্ছিত বর তাহারা?
মানবত্বের গরিমায়
দাঁড়াবে অমর-আঙিনায়?
এই না সে দেশ—বহে নবনীর দরিয়া,—
দাও মা ভরসা লক্ষ্মীর 'কাঠা' ভরিয়া,
"অন্ন মেরু'র বেদিতে
দহি পরসাদ ক্ষুধিতে।
এস অম্বিকা, পূর্ণ বিভূতি-শালিনী
গৃহাণ অর্ঘ্য, অখিল-প্রকৃতি-পালিনী,
বিতর স্বস্তি-সু-বাণী
প্রণমামি ত্বাং ভবানী।
জাগৃহি দেবী, গণ-দেবতার জননী,
নাচ ভৈরবী রক্তবীজের দলনী,
জয় মহামায়া ঈশাণী
চিন্ময়ী হ মা পাষাণী।

বলা-শেষ

মনের কথা রইল মনেই বন্ধু মোর,
নয়ন-কোণেই শুকিয়ে গেল নয়ন-লোর।
আজকে পিছে চাই গো মিছে, নেই সে দিন,
শুনতে যখন অনেক কথা অর্থহীন।
চুরি গেছে বুক-ভরা সে আনন্দ,
পদ্ম-বুকে নেই সে মধু, সে গন্ধ।

সেই অতীত, সেই পুরানো, তার তরে
ব্যথাও আজি তৃপ্তি বিলায় অন্তরে।

আজ যা বুঝি যায়না বলা কথায় আর,—
নীরবতাই গাঁথে আমার ব্যথার হার।
দেয় দুনিয়া মধু-বিষের বুক-জ্বালা,
পাপড়ি-ঢাকা কাঁটায়-গাঁথা ফুল-মালা।
লুকিয়েছে আজ আশা-রানীর মুখখানি,—
বিদায়-বেলা দেয় গো মোরে হাতছানি।
দিন-দুপুরে জ্বাললো বাতি সাঁঝ-তারা,
দুয়ার-পথে রাতের আলো দেয় সাড়া।
হারিয়েছে ঘর পরদেশীয়া এ দরবেশ,—
পিয়াসটুকু না পুরিতেই জীবন শেষ।

ভেবেছিলাম সুখের বাসা এইখানে,
ভুল করে গো বসেছিলাম তার ধ্যানে।
আজকে আমার সেই ঠিকানা, নেইকো দেশ
ভেসেছি ওই নীল-সাগরে নিরুদ্দেশ।
কোন কূলে মোর ব্যথার ব্যথী কে আছে
পৌঁছিবে কি মনের কাঁদন তার কাছে?

মানুবালা

ইকড়ি-মিকড়ি চাম-চিকড়ি
ছক্কা-পঞ্জা-টেক্কা-তিরি
হিজিবিজি বকের ছানা
আমার চিঠি লেখার ছিরি।
সাপের মন্তর হেঁয়ালি শক্ত
মানে বুঝতে মুণ্ডু ঘোরে,
তবু তোমায় লিখিনি ভাই
এমন কিছু শক্ত করে।
পড়তে চেয়েচ জানতে চেয়েচ
আমার কাব্য-গানের খাতা—
আমি একটা মস্ত 'পোয়েট'
আমার কাব্য নয়কো যা-তা।
আমি একটা মস্ত 'পোয়েট'
বাংলায় যারে বলে 'কবি'

নেইকো কেহ আমার সমান
জ্বলছে আমার যশের রবি।
এমন মধুমাসের দিনে
মানুদিদি তোমার হাতে
তিনটি কৌটা 'কুন্তলীন'
পাঠালাম এই চিঠির সাথে—
কুন্তলীনের খুব সুখ্যাতি
তেলের নাকি গন্ধ ভালো
নিয়মমত মাথায় দিলে
চুল না কি হয় কয়লা-কালো।

কুড়ানো পাতা

১

পুরানো খাতার কুড়ানো পাতার কথা,
সারা জীবনের, কত বিচ্ছেদ-ব্যথা।
গিরি-ঝরনার ধারার মতন ঝরে
পাথুরে তটের 'পরে।
ওঠে ফেনাইয়া কতো সুমধুর সুখ-সৃঙ্গের স্মৃতি,
আজ নাকি সেই রাখি-পূর্ণিমা তিথি।
পুরানো খাতার কুড়ানো পাতায়,
লেখার খেলায়, কতো কবিতায়,
কতো মানুষের হাটে
কতো হল পরিচয়—?
কতো ভুল কতো আশা
কিছু ; কিছু নয়।

২

কে জানে গো উড়োপাখি কোথায় চলে যায়,
জেগেই বুঝি দুঃখকীটে মর্ম কুরে খায়।
স্পর্শে কাহার জেগে উঠি, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে
বনের পথে সঙ্গিরা সব ফেলে পালায় মোরে।
কে আসিয়া দেয় গো খুলে আমার মনের ঘোমটা,
অতি কোমল সুরে বাঁধা তার বাজিত কোনটা।

আজ পিছন চেয়ে দেখিনাই গো কেহ নাই,
ধু-ধু করে রৌদ্রভরা মরু সাহারাই।
নামগুলি সব পড়ছে মনে বাসতো যারা ভালো,
চাঁদের মতো যাদের মুখে ফুটতো হাসির আলো।

রুণু

আমার মুখের ছোট্ট ছবি
ভাসে গো তার চোখের তারকায়
রয়ে-রয়ে পলক নাচে
হাসির চমক চমকে আছে
পরী এসে চুম দিয়ে যায়
ফুলের কুঁড়ি ফুটতে ভুলে যায়
স্বর্গলোকের আকাশ দেখে
ক্ষণে-ক্ষণে করিস দেয়ালা
চুমুক দিয়ে চুষিস যখন
মায়ের স্নেহের ননীর পেয়ালা
ভোরের বেলা আলোর পানে চাই
তোরি হাসি দেখতে আমি পাই
তাথৈ-তাথৈ নাচিস যখন তুলনা তার নাই
তোরে ঘিরে ওঠে বেজে মধুর সে শানাই।

আচম্বিতে ছুটিস্ রানী
বুকের ভিতর দুরদুরানি।

মোহন-বাগান

১

জেগেছে আজ দেশের ছেলে,
পথে লোকের ভিড়,
অন্তঃপুরে ফুটল হাসি
বঙ্গ-রূপসীর ;
'গোল' দিয়েছে গোরার দলে,
বাঙালির আজি জিত,

আকাশ ছেয়ে উঠছে উধাও
উন্মাদনার গীত।

২

আজিকার এই বিজয়-বাণী
ভুলবেনাকো দেশ,
শাবাশ-শাবাশ মোহন-বাগান
খেলে ভাই বেশ।
বিনা-সুতার প্রীতির হারে
গাঁথি তরুণ প্রাণ,
উঠেছ এক লক্ষ্য ধরি,
সহায় ভগবান।

৩

দেশ-বিদেশে রটল আজি
বঙ্গ যুবার মান ;
টুটে গেছে সাদায়-কালোয়
মিথ্যা ব্যবধান।
সারা দেশের প্রাণের তারে
উঠল কি ঝঙ্কার ;
আনন্দ-রোল বঙ্গ-ভুবন
করতেছে তোলপাড়।

৪

অকুতোভয় অটল হৃদয়
মিলেছ কয় বীর,
লক্ষ বাধায় দৃকপাত নেই,
তুলেছে আজ শির ;
হয়েছ ভাই তপের ফলে
পূর্ণ-মনোরথ,
অন্ধকারে তন্দ্রাঘোরে,
হারাওনি তো পথ।

৫

দীপ্ত যশের রঙ-মশালে
উজ্জ্বলি দশ দিক,
মর্ত্য-লোকের চোখের 'পরে
দাঁড়িয়েছ নির্ভীক,

রত্ন-প্রসূ বঙ্গ-মাতার
তোমরা সুসন্তান,
সগৌরবে জীবন-পথে
হও গো আগুয়ান।

৬

জেগেছে আজ দেশের ছেলে,
পথে লোকের ভিড়,
অন্তঃপুরে ফুটছে হাসি
বঙ্গ-রূপসীর ;
আজিকার এই বিজয়-বাণী
ভুলবেনাকো দেশ।
শাবাশ-শাবাশ মোহন-বাগান
খেলেছ ভাই বেশ।

বাণী

যে তপন অস্তমিত উজ্জ্বলিয়া অতীতের
কনক-শিখরী,
হৈম আগমনী তায় আবার ফুটিছে ওই
দিগ্বলয় ভরি।
যে বাণী উদাত্ত মন্ত্রে উঠিত হবির গন্ধে
পুণ্য তপোবনে,
তাহারি রাগিণী মৃদু ভাসিয়া আসিছে আজ
সুরভি পবনে।
আজি মঞ্জু জাগরণ, পুষ্পিত সকল বন,
জাগিয়াছে প্রাণ,
মিলেছে সেবকবৃন্দ বাণীর চরণতলে
কি করিবে দান!
কি সে বিলুপ্ত জ্যোতি অনন্ত-গরিমাময়ী
স্বর্ণ অরুণিমা
ফুটায়ে তুলিবে পুন প্রাচ্যের ললাট-তটে
বাঞ্ছিত সুষমা,
তারি লাগি মিলিয়াছে অক্ষম অকৃতিগণ,
যুক্ত করপুট
যাচে সারদার দয়া, ওঠে প্রার্থনার বাণী,
ভাষা অর্ধস্ফুট।
অয়ি মাতঃ বীণাপাণি, অকিঞ্চিতকর এই
অঞ্জলির মাঝে
নাই মা, কিছুই নাই যা তোমার কুন্দশুভ্র
পাদপদ্ম মাঝে।
তবু আশা, হবে পূর্ণ দরিদ্রের গুরুব্রত,
জাগে মনে সাধ,
পাব মাতঃ পাব মাতঃ, তোমার ও চরণের
দিব্য পরসাদ।

নির্বাসিত

১
নহে নহে নহে, নির্বাসন!
ভারতের কোটি-কোটি হৃদি-সিংহাসন
বরি তোমা লইল যখন!

২
জননীর মুখপানে নয়ন,
দেশ-হিতে আত্মসুখ করি বিসর্জন,
যে করে মায়ের পূজা, তাহাতে মা দশভুজা
দশভুজা প্রসারিয়া করয়ে ধারণ!
মাতৃ-অঙ্কে তনয়ের কোথা নির্বাসন!

৩
বীর নাহি ডরে নির্বাসন,
নিজ বক্ষ পাতি ধরে, জননীর বক্ষোপার
না পড়িতে অগ্নিময় বজ্র সুভীষণ!
নির্বাসন অতি তুচ্ছ, স্বর্গাদপি অতি উচ্চ
জননী জনমভূমি মায়ের আসন।
পূজিতে চরণ তাঁয় যায় যদি প্রাণ কার,
না ফিরিবে না হটিবে তনয়—কখন।

৪
সত্য বটে হল "নির্বাসন"
চিত্ত তব, কামনারে করি বিসর্জন!
দারা পুত্র পরিবার কারে না চাহিলে আর,
সঁপিলে মায়ের কার্যে মরত জীবন,
ধন্য হল সমগ্র ভুবন!

পাড়ি

মাঝ-আকাশে পাড়ি দিয়ে, পৌঁছিল চাঁদ
অস্ত-নীলাচলে ;
রক্ত-আলো পড়ল এসে শিউলি-রঙা
দূর্বাদলে-দলে—

কলজেতে আর ধরছে না গো
ছড়িয়ে-পড়া মনটি আজ,
আলো-হাওয়াব ভেলায় চড়ে
ভাবের সুমুদ্দুরের মাঝ
সুদূর যুগের তবঙ্গেতে, অঙ্গে আমার
জ্যোৎস্না পড়ে ঢলে।

ভুবন মম বন্ধু-ভবন, সন্ধ্যা-উষা
দুলিয়ে দে যায় ভেলা ,
চিত্রিত মোর দীপের ছায়ে, দুঃখ-সুখে
খেলছে কতই খেলা!—
কাম-রাবণের সোনার মৃগ
প্রাণ যে করে অশান্ত,
বন্দিনী হায় আত্মা সীতা,
ছুটছি প্রভাত-দিনান্ত,
চলতে দু-পা ঝরছে রূপা, কার নূপুরে
ফুলের হেলাফেলা!

তোমার শোভার দরবারে নাথ, পাড়ি দেব
মুক্তি-ত্রিবেণীতে,
কেটে যাবে বর্ষা-আঁধার, ভাঙ্গবে স্বপন
মর্ত্য-রজনীতে ,
তত্ত্ব-কমল ফুটবে পথে
সত্য-সাগর-তরঙ্গে,
ভুবন-ভরা তপন-তারার
কিরণ তারের সায়ঙ্গে
গান বাজিবে, মন মজিবে, জাগবে বিবেক
সর্ব-ত্যাগের গীতে।

ছোট্ট আমার ভাণ্ডারে নাথ, ধরবেনাকি
তোমার মহাদান?
ফেলতে গেলেও, ছাড়তে গেলেও, তোলপাড় হয়ে
উঠছে আকুল প্রাণ ;
অবুঝ পাখির তীর মিলিবে
অন্ত হতে অনন্তে,
অশান্ত প্রাণ শান্ত হবে
স্বর্গপুরীর বসন্তে ;

ধনের লাগি রূপের লাগি যশের লাগি
পিয়াস অবসান।

নতুন দোলা

অনেক জিনিস উপহার দিয়ে সখা ও সখীরা সবে
নন্দিল মোরে বরণের কলরবে।
পরাইয়া দিল ফাগুয়ার রাঙা হার,—
এত বড় নয় নোবেল পুরস্কার।

সাধ নাহি আর বাহবা নেবার,
নাই কোন নিধি পাহারা দেবার,
নাই কোন চাওয়া, নাই কোন পাওয়া
উদাসীর প্রাণে দখিনা হাওয়া
জাগিল আর একবার।

কি দেব তোদের প্রত্যভিনন্দন?
পর প্রেমহার কুঙ্কুম-চন্দন।
ওরে জ্যোৎস্নার দুলাল, দুলালি
একি সুন্দর দোলায় দুলালি
না জানি কি দিয়ে মনটি ভুলালি,
ওরে কুমুদের মালা।

পাঠালি সাগরে ঢেউয়ের মেলায়
কেয়া-গাছে ঘেরা ডাক-বাংলায়
জরার দরজা খুলে দিলি তোরা
ভাঙিয়া জীর্ণ তালা।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ ১৯ নভেম্বর নদীয়া জেলার শান্তিপুরে মাতুলালয়ে করুণানিধানের জন্ম। পিতা : নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতা : নিস্তারিণী দেবী।

শৈশব : মামা রামনাথ তর্করত্ন ছিলেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর কাছেই ছোটবেলায় লেখাপড়া শুরু। তাঁরই প্রভাবে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি কবির গভীর আসক্তি। ছ-বছর বয়সে বরাকরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বাবার কাছে গিয়ে রাজস্কুলে ভর্তি হন। চারদিকে পাহাড়, ক্ষুদিয়া নদী, নয়নাভিরাম প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য, পিতার সংগৃহীত রবীন্দ্র-রচনাবলী 'ভারতী'-'বালক'-প্রভৃতি পত্রিকা তাঁকে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে। দশ-এগারো বছর বয়সে দারুকেশ্বর নদের তীরে শাল-পিয়ালের বনে চোদ্দ-অক্ষরে পদ্য লিখে শোনাতেন সঙ্গী-সাথীদের। তেরো বছর বয়সে আবার শান্তিপুরে এসে গঙ্গার শোভায় মুগ্ধতা। প্রকৃতিমুগ্ধ কবি ছিলেন শান্তস্বভাব, নিরভিমান ও বন্ধুবৎসল।

শিক্ষা : শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিস ইনস্টিটিউশন এবং শেষে রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন।

বিবাহ : ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে খড়দহের কুলীনপাড়ার লালবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ধরাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। কবির চার পুত্র ও তিন কন্যা।

কর্মজীবন : প্রথমে শান্তিপুরে সোডা-লেমোনেড তৈরির এক ছোট কারখানা স্থাপন করেন। সেই ব্যবসায়িক উদ্যোগের ব্যর্থতায় পর্যায়ক্রমে পাবনা জেলার সুজানগর এম.ই. স্কুল, শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাইস্কুল, গাইবান্ধা হাইস্কুল, হুগলি ব্রাঞ্চ অ্যান্ড মডেল স্কুল, শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন-প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। মাঝখানে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে শিক্ষকতা ত্যাগ করে শান্তিপুরে স্বদেশী দেশলাই তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু পুলিশী হামলায় এই বাণিজ্যিক উদ্যোগেরও অপমৃত্যু ঘটে। এরই মধ্যে গৃহশিক্ষকতার কাজ করেন ইতস্তত। ১৯১০-১৯১৬ উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুল ও হাওড়া জেলা স্কুলে পুনরায় শিক্ষকতা। শেষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে কাজ করেন ১৯৫২ পর্যন্ত।

গ্রন্থ	বঙ্গমঙ্গল (১৯০১); প্রসাদী (১৯০৪); ঝরাফুল (১৯১১), শান্তিজল (১৯১৩); ধান-দূর্বা (১৯২১); রবীন্দ্র-আরতি (১৯৩৭); গীতায়ন (১৯৪৯); গীতারঞ্জন (১৯৫১); গীতাশ্রী (১৯৮৫)।

কাব্য-চয়নিকা : শতনরী (কবি হেমচন্দ্র-বাগচী সংকলিত : ১৯৩০) ; শতনরী (কবি কালিদাস রায়-সম্পাদিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৪৮)।

অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'চিত্রায়ণী' ও 'শেষ-পসরা' গ্রন্থ-দুটি তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'ভারবি'-প্রকাশিত 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

মৃত্যু : ১৯৫৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১০টায় শান্তিপুর হেল্‌থ সেন্টারে ৭৮ বছর বয়সে কবির মৃত্যু হয়।